ভুল করার পর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

www.allbdbooks.com

হ্যাঁ, ওই লোকটা! ওই লোকটাই আড়ায় আড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর তার ওপর নজর রাখে। উঁকি মেরে দেখে নেয় তাদের ঘর-গেরস্থালি। কখনও ছুরি-কাঁচি-বঁটি শান দিতে চলে আসে, কখনও শিল কুটাওয়ালা হয়ে শিলনোড়া কুটে দিয়ে যায়, পিঠে বস্তা নিয়ে এসে পুরনো খবরের কাগজ ওজনদরে কিনে নিয়ে যায়। ওই লোকটাই কি মাঝে মাঝে জলের কল সারাতে আসে না? কিংবা ইলেকট্রিক মিস্তিরির ছদ্মবেশে। অনেক আইডেন্টিটি, কিন্তু একটাই লোক। কখনও নিশুত রাতে, কখনও বা ছুটির নির্জন দুপুরে নানা ফাঁকফোকর দিয়ে ওই লোকটারই চাপা গলা শুনতে পাওয়া যায়, আর ইউ হ্যাপি, সত্যেন?

এই প্রশ্নের জবাব কি সত্যেন নিজেই জানে? হ্যাপিনেস কথাটারই বা আই ডি কি? কোনওদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হলেই হ্যাপি লাগে, আবার চুরানব্বইতে সচিন আউট হলেই আনহ্যাপি। হ্যাপিনেসের

কোনও মাথামন্ডু নেই, স্ট্যান্ডার্ড নেই, সময় অসময় নেই।

একটা বিষণ্ণ, গোমড়ামুখো, সাবেক আমলের বাড়ির সামনে মোটরবাইকটাকে দাঁড় করিয়ে নামল সত্যেন। বাড়িটার স্থাপত্যে কোনও শিল্প বা সৌন্দর্য নেই। সাদামাঠা তিনতলা উঠে গেছে। ইট-রঙা দেওয়াল। কলকাতার মতো এত কুচ্ছিত বাড়ির ভিড় বোধহয় আর কোনও শহরে নেই। সদর দরজার পাশে বড় একটা প্লাস্টিকের সাইনবোর্ডে প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজিতে লেখা 'শান্তিনীড়'। গুণের মধ্যে বাড়িটা বেশ বড়, দু'ধারে দুটো উইং। একটা পুরুষদের, অন্যটা মহিলাদের। তিনতলার বারান্দা থেকে একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে খুব লক্ষ করছে। তার সাদা বাবরি চুল, গায়ে একটা বোতাম-খোলা হাফ শার্ট, পরনে ডোরাকাটা পায়জামা। ওই লোকটাই কি হয়দাদু? উঁহু, হয়দাদু অনেক লম্বা মানুষ।

মোটরবাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে লক করল সত্যেন। এখন ভোর ছ'টা বাজে। এই সময়টায় কলকাতায় জাগ্রত লোকের চেয়ে ঘুমন্ত বা অন্তত শায়িত লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। কারও কাছে কর্মোপলক্ষে এই সময়টায় যাওয়া প্রশস্ত নয়। লোকের প্রাতঃকৃত্যাদিও তো থাকে রে বাপু।

ভিতরে ঢুকতেই রিসেপশন লেখা একটা কেঠো কাউন্টার। সেখানে অবশ্য কেউ নেই। একটা প্যাংলা চেহারার ছোকরা নিচু হয়ে ঝাড়ু মারছে মেঝেয়। তার হাঁটু অবধি গোটানো প্যান্ট, গায়ে ঘন নীল ডোরাকাটা টি-শার্ট, চুল শাহরুখের মতো। খুব স্মার্ট তার মুখশ্রী।

সত্যেন বলল, "আচ্ছা, হরগোপাল রায়— "

বাকিটা বলতে হল না। ছোকরা তাকে একবার দেখে নিয়ে ঝাড়ু না থামিয়েই বলল, "দোতলায় বাঁ সাইডে। সাত নম্বর ঘর। সিধা চলে যান।"

নারীপ্রেম ব্যাপারটা কত দূর মহৎ এবং একজন মহিলার জন্য কতটা আত্মত্যাগ করা যায় তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যেনের কেন যেন মনে হয়, একজন মহিলার জন্য একজন পুরুষের এত তুলকালাম করার তেমন কোনও কারণ থাকতে পারে না। তবু এইরকম যুক্তি-বহির্ভূত ব্যাপার-স্যাপারগুলো কিন্তু আবহমানকাল ধরে ঘটেই আসছে। পছন্দের মেয়েটিকে বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে পিছনে ধেয়ে আসা তির, বল্লম, বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে পুরুষ কতবার পালিয়েছে তার কি হিসেব আছে? আজও পালায়। তারপর যাকে পায় সে হয়তো বা এক নম্বরের কুঁদুলে, স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা, এত মেহনতের উপযুক্ত মজুরিই নয়। উল্টোদিকে মেয়েটিরও মনে হতে পারে, এ তো এক পশু ও পেশিশক্তির প্রতীক মাত্র, গুন্ডা ও ধর্ষণকারীর সমগোত্রীয় এবং বহুগামী, বিশ্বাসের অযোগ্য একটা লোক।

তবু মোহনবাঁশি বেজেই চলে এবং শ্রীরাধিকার মন আউল-বাউল হতেই থাকে। যেমন হয়েছিল হয়দাদু আর নিরুপমার। প্রেমটা আজকের নয়, এখানকারও নয়। ঘটেছিল বগুড়ায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। বাইশ বছরের হয়দাদুর সঙ্গে সপ্তদশী নিরুপমার। নিরুপমার বাড়িতে ঘোর আপত্তি ছিল। হয়দাদুর বাড়িরও সমর্থন ছিল না। নিরুপমা হয়দাদুর সঙ্গে পালানোরও চেষ্টা করেছিল। ধরা পড়ে যায়। মেয়েকে নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন নিরুপমার বাবা আর মা।

পরিণতিটি যথাবিধি করুণ। নিরুপমাকে ধরেবেঁধে এক তথাকথিত সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। বুকে হুতাশন নিয়ে হয়দাদু অবিবাহিত থেকে গেলেন। মাঝখানে নানা সামাজিক পটপরিবর্তন, স্থানত্যাগ ইত্যাদির কারণে বছর দশেক অতিক্রান্ত হলে হয়দাদুর সঙ্গে তাঁর নিরুপমার ফের যোগাযোগ হল কলকাতায়। হয়দাদু তখন গড়পারে আর নিরুপমা তাঁর মেয়েকে বলাই সিংহ লেন থেকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে রোজ আসেন। সেইখানেই আকস্মিক দেখা। এবং দশ বছর পর ফের বজ্রপাত। তবে হয়দাদু সেই অশ্বারূঢ় লুঠেরা বীরপুরুষ নন। নিতান্তই স্তিমিত মানুষ, কোনও খেলারই নিয়ম ভাঙার সাহস তাঁর ছিল না, এখনও নেই। এখনও বিধবা, নিঃসঙ্গ নিরুপমার সঙ্গে পরস্ত্রীর দূরত্ব বজায় রেখে শান্তিনীড়ের দু'টি উইং-এ দু'জন বসবাস করেন। ঠিক মিলন হয়তো হল না, কিন্তু এই কাছাকাছি হওয়ারও হয়তো কিছু মূল্য আছে।

সত্যেন সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল। বিশ বছর দেখা নেই হয়দাদুর সঙ্গে। চেনা যাবে না। তাকেও নিশ্চয়ই মনে নেই হয়দাদুর।

রায় বংশের ধারা অনুযায়ী পুরুষরা বেশির ভাগই লম্বা এবং সুঁটকো সিড়িঙ্গে চেহারার মানুষ। সাত নম্বর ঘরে একখানা প্রশস্ত চৌকির ওপর উবু হয়ে বসে যাকে বড় জাবদা খাতায় কিছু হিসেবপত্র কষায় নিমগ্ন দেখা গেল তাকে ঠিক সুন্দরী নিরুপমার রোমান্টিক প্রেমিক বলে আর মনে হয় না।

"হয়দাদু!"

মানুষটা মুখ তুলে একটু হাঁ করে চেয়ে রইলেন, "কেডা রে?"

"আমি সত্যগোপাল। সত্যেন।"

"সত্যগোপাল। কোন সত্যগোপাল?"

"আমার বাবা গৌরগোপাল।"

"হ, হ, গৌর। তুই গৌরের পোলা। জুতা খুইলা ভিতরে আয়।"

এই সুঁটকো চেহারার মানুষদের বয়স বোঝা যায় না। বিশ বছর আগে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যে-হরগোপাল বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন হুবহু সেই লোকটাই এখন চৌকির ওপর উবু হয়ে বসা। তেমন কোনও সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন হয়নি। মাথার চুলগুলো পেকে গেছে, এই যা।

জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে হয়দাদু কিছুক্ষণ কিছু অনুমান করার চেষ্টা করলেন। তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "কিছু কবি? কোনও বার্তা আছে নাকি রে?"

এই কাজটাই কঠিনতম। কারণ এই ভিতু ও পলায়নী মনের মানুষটি যখন বাড়ি ছেড়ে বৃদ্ধাবাসে চলে আসেন তখন বলেই এসেছিলেন, "আমারে তোমরা কোনও খবর দিও না। ভাল খবরও না, মন্দ খবরও না।"

কিন্তু গোষ্ঠগোপাল কাল রাতেই ঘোষণা করলেন, "খবরটা হরগোপালরে দিতেই হইব। তার তো কৃত্য আছে। মহাগুরুনিপাত বইল্যা কথা। অশৌচ আছে, হবিষ্য আছে।"

সেই খবর দিতেই আসা। সোজা শ্মশান থেকে।

হরগোপালের মোবাইল নেই। তবে 'শান্তিনীড়'-এর ফোন নম্বর ছিল। কিন্তু গোষ্ঠগোপাল ফোনে খবরটা দেওয়ার পক্ষপাতী নন। বলেছিলেন, হারামজাদা সম্পর্ক রাখে না ঠিকই, কিন্তু হ্যায় তো আর কুটুম না। মায়ে তো দশ মাস তারে প্যাটে ধরছে। সামনাসামনি গিয়াই খবরটা দিয়া আইতে হইব।

ছোট সিঙ্গল ঘর। চৌকিতে পাতলা তোশকের নামমাত্র একটা বিছানা পাতা। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একটা আলনা, ছোট একখানা প্লাস্টিকের টেবিল, একটা ফোল্ডিং চেয়ার। চৌকির মাথার দিকে একখানা বইয়ের শেলফে কিছু বইপত্র।

ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসল সত্যেন।

জাবদা খাতাটায় চোখ নামিয়ে হরগোপাল বলেন, "খারাপ খবর তো!"

"হ্যাঁ দাদু।"

"কইও না। আই ক্যান ইমাজিন।"

সত্যেনের সারা রাত শ্মশানে কেটেছে। দাঁড়িয়ে এবং হাঁটাহাঁটি করে। শরীর এখন স্নান চাইছে, বিশ্রাম চাইছে। সংসার-পলাতক এই লোকটাকে তার তেমন মায়া হচ্ছে না।

"আপনি খবরটা শুনতে চান না কেন?"

"অল ট্রুথস আর টেরিব্‌ল। বোঝলা?"

"তা বলে সত্যের কাছ থেকে কত দূর পালাবেন আপনি?

লোকটা জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে রইল। ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। বললেন, "তুই কার পোলা কইলি য্যান!"

"গৌরগোপাল, গোষ্ঠগোপালের মেজো ছেলে।"

"হ হ, গৌর। গৌরের গায়ের রংখান ধলা, চক্ষু কটা। মেলা ল্যাখাপড়া করছে।"

"ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায় দাদু? ব্যাপারটা অত সোজা

www.allbooks.com

না।"

"না? আমাগো এইখানে করালীবাবু আছে। করালী ব্যানার্জি। তার অ্যালঝাইমার্স। বোঝলা! কিছু মনে নাই তার। দুই পোলা, নাতি-নাতনি কাউরে চিনতে পারে না। কোন শহরে আছে, কত নম্বর বাড়িতে বাস, বংশপরিচয় কী, বাপের নাম, সব ভুইল্যা মাইরা দিছে। লোকে করালীবাবুর অবস্থা দেইখ্যা দুঃখ করে। আমি তো কই, করালী ইজ এ ভেরি হ্যাপি ম্যান। পিছটান নাই, খারাপ স্মৃতি নাই, শোকতাপ নাই। দুনিয়া ভাইস্যা গেলেও করালীর তাপ-উত্তাপ থাকবো না।"

"আপনি কি স্মৃতিভ্রষ্ট হতে চান দাদু?"

"হইলে মন্দ হইত না। তর নাম জানি কি কইলি?"

"সত্যগোপাল। সবাই সত্যেন বলে ডাকে। আপনার কি মেমোরি নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে? আমার নামটা দু'-তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।"

হরগোপাল নেতিবাচক একটা মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, "নাঃ। মাই মেমোরি ইজ পেইনফুলি শার্প। সেইটাই প্রবলেম।"

"কিন্তু খবরটা আপনার জানা দরকার।"

হরগোপাল একটু হতাশ গলায় বলেন, "কিন্তু এইখানে নিয়মনিষ্ঠা পালনের অসুবিধা আছে। হবিষ্য, কুশাসন, ধড়া জোগাড়যন্তর করে কে?"

"অশৌচ পালন না করলে করবেন না। আজকাল অনেকেই ওসব বিশেষ মানে-টানে না। কিন্তু খবরটা দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। আপনার মা গিরিবালা রায় কাল রাত আটটা বাহান্ন মিনিটে মারা গেছেন। তাঁর একশো চার বছর বয়স হয়েছিল।"

হরগোপাল একটু গুম হয়ে রইলেন।

সত্যেন জিজ্ঞেস করল, "আর ইউ শক্‌ড্?"

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হরগোপাল বললেন, "নাঃ। কয়েক বছর আগে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলাম মায় মইর‍্যা গেছে। তখনই ধইরা নিছিলাম, মায় বোধহয় আর নাই। এতকাল যে বাইচ্যা আছিল হেইটাই তো একটা সারপ্রাইজ। না হে, খবরটা শুইন্যা তেমন ধাক্কা লাগল না তো।"

"আমার দাদু গোষ্ঠগোপাল বলে পাঠিয়েছেন, আগামী ষোলোই জুলাই গিরিবালা দেবীর শ্রাদ্ধ। একটা দিন আপনি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকেন তাহলে সবাই খুব খুশি হবে।"

হরগোপাল আঁতকে উঠে বললেন, "না না! কও কি? আবার ফান্দে পা দেয় কোন আহাম্মক? না হে, এই বেশ আছি।"

"সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে আমাদের তরফ থেকে বলা রইল, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।"

হরগোপাল কেমন যেন হতভম্ব মতো হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ধনভাইয়ের বয়স কত হইল কও তো!"

"অষ্টআশি। আপনাদের বেশ দীর্ঘজীবী পরিবার।"

হরগোপাল যেন মনে মনে একটু হিসেব করে নিয়ে বলেন, "ধনভাইয়ের অষ্টআশি হইলে মোনাভাইয়ের অখন ছিয়াশি।"

"আপনার মেমোরি তো ঠিকই আছে।"

"কিন্তু পেইনফুল, বোঝলা! মেমোরির অনেক কষ্ট।"

"সকলের কাছে নয়, অনেকে তো স্মৃতি আঁকড়েই বেঁচে থাকে।"

হরগোপালের ঘরখানায় বেশ আলোবাতাস আছে। ডানধারটা বোধহয় দক্ষিণ। জানালা দিয়ে হু হু করে জোলো বাতাস আসছে। আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে।

"ওয়াজ ইট পিসফুল?"

সত্যেন অবাক হয়ে বলে, "কীসের কথা বলছেন?"

"মায়ের কথা। ডিড শি ডাই পিসফুলি?"

"হ্যাঁ। শি ডায়েড পিসফুলি। গত দু'বছর তাঁর ভীমরতি চলছিল। গতকাল বিকেলেই কোমায় চলে যান। শি সাফারড নো পেন। আর একটা কথা।"

"কী কও তো!"

"গিরিমার কিন্তু ধারণা ছিল যে আপনি বেঁচে নেই। আর আমরা তাঁর কাছে মৃত্যুসংবাদটা গোপন করছি। কিন্তু মায়ের মন তো খারাপটা মেনে নিতে পারে না, তাই হয়তো খানিকটা দ্বিধায় ভুগতেন। আপনি একবার গিয়ে দেখা দিয়ে এলে তাঁর এই দ্বিধার যন্ত্রণা থাকত না।"

"হুঁ। তুই কি চা খাবি?"

"চা! আমি শ্মশান থেকে ডাইরেক্ট আসছি। এখন বাড়ি যাব, চানটান করতে হবে। তারপর ওসব।"

সেই ঝাড়ুদার ছোকরা দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "দাদু!"

"কী রে!"

"আপনার কাছে কে এসেছে! লাতি নাকি?"

"হ।"

"আপনারও তাহলে লাতিপুতি আছে দাদু?"

"দুর ব্যাটা নিব্বইংশার পো। নাতি থাকবো না ক্যান?"

সত্যেন বলল, "আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর কি আপনার জানা আছে? পুরনো নম্বর কিন্তু এখন আর নেই।"

"ক্যান কও তো!"

"যদি বাই চান্স আপনি আমাদের বাড়িতে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে জানিয়ে দেবেন।"

"ক্যান, জানাইতেই বা হইবো ক্যান? বাড়িতে কি জায়গার অভাব?"

"তা নয়।"

"বহুকাল আলগা থাইক্যা আমার ধাত বদলাইয়া গেছে। অখন আলগা থাকাই ভাল। আর মানাইয়া গুছাইয়া লইতে পারুম না। মাইনসে ভাবব পাগলডা কোই থিক্যা আইল! ধনভাইরে কইও আমি এইরকমই ভাল আছি।"

"তাই বলব দাদু। চলি।"

"তোমার নাম তো সত্যেন?"

"হ্যাঁ।"

"খাড়াও। এই কাগজটায় তোমার ফোনের নম্বরটা লেইখ্যা দিয়া যাও।"

জাবদা খাতার পাশ থেকে একটা ছোট প্যাড বের করে দিলেন হরগোপাল, সঙ্গে একটা সস্তা ডটপেনও। সত্যেন নম্বরটা লিখে নিয়ে হরগোপালের দিকে চেয়ে দেখল, হরগোপাল খুব কৌতূহলের সঙ্গে তার হেলমেটটা দেখছেন।

"টুপিখান বড় জব্বর।"

"এটা টুপি নয়, হেলমেট।"

"জানি। দুই চাক্কার গাড়ি সর্বনাশা জিনিস।"

"আসি দাদু।"

"আসো গিয়া। বাইচ্যাবুইচ্যা থাকো গিয়া হগ্গলে।"

এটা একধরনের আশীর্বাদ কিনা তা বুঝতে পারল না সত্যেন। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাকে একটা প্রণাম অন্তত করতে দিন।"

অবাক হয়ে হরগোপাল বললেন, "প্রণাম! অশৌচের মইধ্যে প্রণাম কীসের? আমাগো হিন্দুগো অনেক ফ্যাকড়া রে ভাই। মেলা বিধিনিষেধ। আসো গিয়া।"

সত্যেন নেমে এল। দূরত্বটা খুব বেশি ছিল না। লেক গার্ডেন্স থেকে ঠাকুরপুকুর। কিন্তু গত বিশ বছরে এই দূরত্বটাই যেন লক্ষ যোজন বেড়ে গেছে।

কেমন আছেন নিরুপমা? তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, নিরুপমাকেও একবার দেখে যায়। চৌরাস্তার কাছেই থাকে প্রিয়াঙ্কা, সত্যেনের খুড়তুতো বোন। সে মাঝে মাঝে এসে দু'জনকেই দেখে-টেখে যায়। নিরুপমা যে জাতের সুন্দরী ছিলেন তা নাকি এখনও বোঝা যায়। শোনা যায়, মার্কিন দেশে প্রবাসী মেয়ে বহুবার মাকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছে, নিরুপমা রাজি হননি। নাঃ, প্রেম ব্যাপারটা সত্যেন ঠিক বোঝে না।

কোনও কোনও মানুষের কিছু অদ্ভুত ডেফিসিয়েন্সি থাকে। তার যেমন। এই সাতাশ বছর বয়স অবধি সে প্রেমের কেমিস্ট্রি ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারল না। আশি ঠেঙানো বয়সে মানুষের কি আর রসকষ বলে কিছু থাকে? আদান-প্রদানেরও তেমন কিছুই থাকে না, যদি না

www.allbooks.com

একে অন্যের বাঁধানো দাঁত বা চশমা ধার নেয়। দেহবৃক্ষ ছাড়া প্রেমের ফুল ফল ফোটারও কথা নয়, ফলারও কথা নয়। তবে এটা হচ্ছেটা কি?

প্রেম সম্পর্কে তার মোহভঙ্গের পিছনে পিউদিদির কিছু অবদান আছে। বংশে পিউদিদির মতো সুন্দরী খুব বেশি নেই। ফরসা রং, বড় বড় চোখ আর কোঁকড়া চুলে বেশ একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন চেহারা। টাইফয়েডের সময় তার ব্লাড স্যাম্পেল নিতে আসত প্যাথোলজি ল্যাবরেটরির একটা ছোকরা। মন্দার। বেশ মিষ্টি দেখতে ছিল বটে ছেলেটা। কথাবার্তায় খুব পালিশ। বাড়ির কেউ এই দু'জনের রসায়ন ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। টাইফয়েড সেরে গেল বটে, কিন্তু দুরারোগ্য অন্য সংক্রমণটি রেখে গেল। মাস ছয়েক বাদে একদিন পিউদিদি হাওয়া হয়ে গেল বিনা নোটিসে। তখন তার জোরদার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। দুর্দান্ত সব পাত্রের খবর আসছে বালিগঞ্জ, নিউ ইয়র্ক, দিল্লি এবং বেঙ্গালুরু থেকে। দু'-এক পার্টি পিউদিদিকে দেখে দেগে রেখে গেছে। বিয়ে হয়-হয়। জ্যাঠামশাই নিত্যগোপালের শ্বাসে প্রশ্বাসে পিউ-ধ্বনি শোনা যেত। মেয়ে পিউকে তিনি চোখে হারাতেন। সেই মেয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁর বাস্তবিকই মৃদু হার্ট অ্যাটাক হল। পুলিশ এল, মিসিং ডায়েরি হল। কিন্তু বাড়ির পুরনো কাজের মেয়ে জয়ন্তী বলল, তোমরা খুঁজে পাবে না গো। দিদিমণি ওই মন্দার ছোঁড়ার সঙ্গে পরশু ট্যাক্সিতে চাপল, হাতে সুটকেস। ঠিক সন্ধেবেলা।

পাওয়া গেল না। প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি থেকে মন্দারের ঠিকানা নিয়ে টালিগঞ্জের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল তারা। মন্দারের মাঝবয়সি সাদামাঠা মা-বাপ ভয় খেয়ে বলল, তারা কিছু জানে না। তবে একটা মুখরা বোন খুব তড়পাচ্ছিল। বলছিল, দু'জনেই অ্যাডাল্ট। দেশে আইন আছে। কে কী করবে দেখব তো! পাড়ার ছেলেছোকরাও এসে ও-বাড়ির পক্ষ নিল।

কারও কিছু করার ছিল না। জ্যাঠামশাই কয়েকদিনের মধ্যেই যেন শোক-দুঃখ-দীর্ঘশ্বাসের একটা পুঁটুলিতে পরিণত হলেন। অত বড় লম্বা মানুষটাকে আর যেন তেমন লম্বা মনে হত না। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলেন। বাজারহাট করার নেশা ছিল, খুব ব্রিজ খেলে বেড়াতেন, প্রিয় ছিল পান আর খুব দামি জর্দা। একজন আমুদে মানুষ। সব খেলনা বিলিয়ে দিয়ে অভিমানী শিশুর মতো বারান্দার কোণে একখানা কেঠো চেয়ারে বসে থাকতেন শুধু। পিউদিদির প্রেম যে এত মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা দেখে সেই বাল্য বয়সে ভারি বিস্ময় ছিল সত্যেনের। ঘটনাটা তাকে এতটাই উত্তেজিত করেছিল যে, তার বন্ধু নীলমণির বোন সুমিতাকে লেক ক্যাম্পের একটা ছেলে লাইন মারত বলে তাকে দু'নম্বর রেলগেটের কাছে প্রচণ্ড পেটায় সত্যেন। সে একাই, নীলমণিকে হাত লাগাতে হয়নি। আর তার ফলে লেক ক্যাম্পের ডেঞ্জারাস ছেলেরাও পরে শোধ নিতে আসে। সত্যেনের তখন রোজ মারপিটের প্রোগ্রাম ছিল। মাথা ফেটেছে, ঠোঁট ফেটেছে, চোখ ফুলে গেছে, তবু উল্টে দ্বিগুণ মারতে ছাড়েনি সত্যেন।

প্রেম সম্পর্কে তার বিরাগ আরও বাড়ল, যখন দু'বছর পরে একদিন কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে পিউদিদি ফিরে এল। তাকে প্রথমে কেউ পিউ বলে চিনতেই পারেনি। গায়ের ফরসা রংটা যেন সস্তা শাড়ির মতো এক কাচাতেই উঠে গেছে। রোগা, হাড়গিলে, হনু উঁচু এক বয়স্কা মহিলার মতো দেখতে হয়েছে পিউদিদি। চোখের কোলে সর্বদা চোখের জল যেন জমেই থাকে। মুখে কথা নেই। যে যা জিজ্ঞেস করে তার জবাবে কেবল মাথা নাড়া দিয়ে কাঁদে। শোক আর অন্ধকার নিয়ে এই নীরব ফিরে আসা তাদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িটাকে একেবারেই উদ্বেলিত করল না। হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দ দেখা দিল না জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থানেও।

শান্তিনীড়ের দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে মোটরবাইকটা ঘুরিয়ে নিল সত্যেন।

গিরিবালা গত হলেন। তাঁর মৃত্যুতে কার কী এল গেল তা বুঝে উঠতে পারছে না সত্যেন। হয়দাদুর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। তেমন উদ্বেল হননি তার দাদু গোষ্ঠগোপালও। গিরিবালার মেজো ছেলে বংশীগোপাল কাজের মানুষ, তাঁর শোকের সময় নেই, বরং দাহকাজ, পুরুতকে খবর দেওয়া, ডেথ সার্টিফিকেটের ফটোকপি করা, খবরের কাগজে শোকসংবাদ বিজ্ঞাপিত করা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। বাবা, জ্যাঠা, কাকাদের সময়োচিত গাম্ভীর্য ছাড়া আর কোনও শোকের প্রকাশ দেখা যায়নি। বেশিদিন বেঁচে থাকলে বোধহয় লোকে বোর হয়ে যায়। তবে আর এক দিক থেকে গিরিবালা ভাগ্যবতী। তিনি ও তাঁর স্বামী জয়গোপাল যে ছোট্ট দাম্পত্যজীবন শুরু করেছিলেন তা পাঁচ পুরুষ পর নানা শাখাপ্রশাখায় কী বিপুল বিস্তার লাভ করেছে! মাছের মায়ের মতো অবস্থা হয়েছিল গিরিবালার, ছানাপোনাদের সবাইকে চিনতেনও না। সোজা কথা তো নয়, অধস্তন পাঁচ পুরুষ বলে কথা!

আদম আর ইভ যদি আজ হঠাৎ এসে হাজির হয় তাহলে তাজ্জব হয়ে দেখবে, তারা দু'জনে মিলে কী অশৈলী কাণ্ডই না ঘটিয়ে গেছে! তাদেরই বংশধররা গিজগিজ করছে দুনিয়া জুড়ে। কোটি কোটি। বান্টু, জারোয়া, সাহেব, কাবলি, চিনেম্যান, এস্কিমো, কালো, ধলো, বাদামি। হকচকিয়ে যাওয়ার কথা।

গিরিবালারও কি অনেকটা ওই রকম হয়েছিল? চার ছেলে, তিন মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনিই তো অনেক। আর পুতি-পুতনির তো হিসেব নেই। তারও পরের প্রজন্ম যখন আসতে শুরু করেছে তখন কি গিরিবালার এই দীর্ঘ জীবনের জন্য লজ্জা বোধ হত?

সত্যেন ঠাট্টা করে বলত, "ভারতের জনসংখ্যা তুমি আর জয়বাবা কী পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছ গিরিমা!"

গিরিবালা হেসে বলতেন, "জন কি বেশি হয় রে বাবা! কোনটা পড়ল, কোনটা মরল হেই চিন্তায় আমার তো রাত্তরে ঘুমই আহে না। জনের বড় জ্বালা রে বাবা।"

দুই

বিপদনাশিনী জানেন তিনি খুব বোকা লোক। আর সেই জন্যই তিনি দোকানপাটে জিনিস কিনে অনেকক্ষণ ধরে হিসেব কষে ফেরত পয়সা বুঝে নেন। আজ রেশনের দোকানে তাঁকে পঞ্চাশ পয়সা কম ফেরত দিয়েছিল। ব্যাপারটা ধরতে তাঁর প্রায় দশ মিনিট সময় লাগল।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "কেদার, তুমি আমাকে পঞ্চাশ পয়সা কম দিয়েছ।"

এ সময়ে দোকান ভিড়ে ভিড়াক্কার। কেদার প্রথমটায় কানেই তুলল না। চেঁচামেচি ঠেলাঠেলিতে কে কার কথা শোনে। কিন্তু বিপদনাশিনীর ধৈর্য অপরিসীম। ওই ঠেলাঠেলি চেঁচামেচির মধ্যেই কাউন্টারের একটা দিকে কোণ চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। গরম, ঘাম, তাচ্ছিল্য। ওসব তার গা-সওয়া।

বার তিনেক পিছু হটে এবং তারপর এগিয়ে হাতটা কাউন্টারে ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা আর টাকা সমেত মুঠোটা মেলে ধরে ফের বললেন, তুমি আমাকে পঞ্চাশ পয়সা কম দিয়েছ কেদার।

বিরক্ত কেদার খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও বিরক্তি চেপে ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ পয়সার একটা কয়েন ঠিক ভিখিরিদের ভিক্ষে দেওয়ার মতো ফেলে দিয়ে বলে, "ভিড়ের মধ্যে একটু-আধটু গোলমাল হয়ে যায় মাসিমা।"

কাউন্টার থেকে হাতটা বের করে নীরবে তাঁর দুটো ভারি ব্যাগ দু'হাতে তুলে নিলেন বিপদনাশিনী। গম, চাল, ডাল, তেল। অন্তত বারো-তেরো কেজি ওজন।

রেশন দোকানের বাইরে মোড়ের কাছেই পর পর রিকশা দাঁড়ানো থাকে। কিন্তু রিকশাওয়ালারা কখনও বিপদনাশিনীকে জিজ্ঞেস করে না, মাসিমা, যাবেন নাকি! কারণ তিনি রিকশা নেন না। কখনওই না।

জুলাই মাস বর্ষাকাল। কিন্তু দু'দিন বৃষ্টি নেই। বরং বাধা রোদ্দুর আর ঘেমো গরমে বাইরেটা যেন বিষিয়ে আছে। বিপদনাশিনীর অবশ্য একখানা ছাতা আছে, কিন্তু তৃতীয় বা চতুর্থ হাত নেই। ফলে গমের ব্যাগেই ছাতাটা মুড়েসুড়ে রেখে দিয়েছেন। এমনিতেই তিনি বেঁটে মানুষ, দু'টি হাতের ভারে শরীরটা যেন আরও একটু বেঁটে হয়ে যায়।

www.allbdbooks.com

কালের ঘামে চশমাটা একটু ঝাপসা। তবে এসবে কিছু হয় না বিপদনাশিনীর।

দ্বিতীয় মোড় ছাড়িয়ে ডান দিকে গলির মুখটাতে জয়রামের দোকান।

জয়রামের দোকানে গমের ব্যাগটা নামিয়ে আঁচলে মুখের ঘাম মোছার ফুরসত পাওয়া গেল। লাইন আছে, তাঁর সামনে আরও দু'জন। কিছু যায় আসে না তাতে।

গম মেপে নিয়ে আটা দিয়ে দিল জয়রাম। মুশকিল হল, আগের বারে জয়রামের দাঁড়িপাল্লা নেই। একটা ডিজিটাল ওয়েয়িং মেশিন এনেছে। লেখাগুলো সবসময়ে বুঝতে পারেন না বিপদনাশিনী। ঠকে যাচ্ছেন কিনা তা বুঝতে না পেরে মনটা খুঁতখুঁত করে। তবে ঠকেছেন বলে মনে হয় না। বহুকাল ধরে জয়রামের দোকানেই গম ভাঙাতে আসেন তিনি। ওজনের হেরফের হলে বুঝতে পারতেন। মাল বয়ে বারেরও তো একটা আন্দাজ হয়েছে।

গলির আরও একটু ভিতর দিকে তাঁর বাড়ি। পাকা এবং দোতলা। একতলায় ভাড়াটে আছে, যাদের সঙ্গে বহুকাল মামলা এবং ঝগড়া চলছে।

বিপদনাশিনীর রং কালো, মুখশ্রীর কোনও ছিরিছাঁদ নেই, কেউ কখনও তাকায়নি তার দিকে। অবশ্য তাতে বিপদনাশিনীর কিছুই এসে যায় না। সরু সিঁড়িটার চতুর্থ ধাপে কেউ জল ফেলে গেছে। ভারী দু'-হাতে থলি নিয়ে হাওয়াই চটি পরা পা পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সেরকম কোনও দুর্ঘটনা বিপদনাশিনীর ঘটে না। তিনি সাবধানে জলের জায়গাটা বাঁচিয়ে পা ফেলে উঠে গেলেন। এক্ষুনি নেমে ওই জায়গাটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে হবে। শরীরে কোনও ক্লান্তি নেই তাঁর। এই দেহ-মেশিনটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনা বিশ্রামে চলতে পারে।

স্বামী মিহির যে তাঁকে পছন্দ করেন না এটা বোকা হলেও বুঝতে তাঁর মোটেই দেরি হয়নি। এরকমই হবে বলে ধরেই নেওয়া ছিল বিপদনাশিনীর। মিহির পম্পা নামে একজনকে ভালবাসেন বলে জানেন বিপদনাশিনী। তা নিয়ে তাঁর অবশ্য কোনও কৌতূহলই নেই। কে কাকে ভালবাসবে আর কাকে বাসবে না, এটা ঠিক করার ভার তো তাঁর ওপরে নেই। তাঁকে যে মিহির ভালবাসেন না এটা জেনে নিয়ে তিনি আপনমনে রাঁধেন বাড়েন, গেরস্থালির গোছগাছ করেন, বাজারহাটে যান, বেশ তো কেটে যায়।

খুব যত্নের সঙ্গে সিঁড়ির জলটা শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে নিলেন তিনি। এখন, মাত্র সকাল ন'টা বাজে। এ সময়ে তিনি এক কাপ চা খান। আর ওইটেই তাঁর একমাত্র নেশা। হরিপ্রিয়র মুদির দোকানের সস্তা গুঁড়ো চা। দাম খুবই কম। চা'টার একটাই গুণ, একটুখানি চায়েই কড়া রক্তবর্ণ লিকার হয়। তাতে একটু চিনি আর এক কোটা দুধ ফেলে দেন বিপদনাশিনী। চায়ের কষে জিব, কণ্ঠা সব তেতকুটে হয়ে যায়। আর সেটাই ভারি উপভোগ করেন তিনি।

বিপদনাশিনীর কোনও কাজের লোক নেই। ঠিকে ঝি বা রান্নার লোক কখনও রাখার দরকার বলেই মনে হয়নি তাঁর। অন্যের কাজ তাঁর পছন্দও হয় না। ছাদ থেকে একতলার সিঁড়ির চাতাল অবধি এত যে ঝকঝকে আর তকতকে তা নিজের হাতে ঝাড়েন মোছেন বলেই সম্ভব। তাঁর মাজা বাসনে কোনও দাগ বা ময়লা কখনও থাকে না। তাঁর কাচা বা ইস্তিরি করা কাপড়চোপড় স্টিম লন্ড্রিকেও লজ্জা দেয়।

রিটায়ার করার পর মিহির এখন একটা হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানির সেলসম্যান। বিভিন্ন দোকান আর এজেন্সিতে ঘুরে মালপত্র সাপ্লাই দিয়ে বেড়াতে হয়। বেশ পরিশ্রমের কাজ। সকালে রুটি-তরকারি আর দুধ খেয়ে বেরোন, লাঞ্চ বাইরেই করেন, আর রাতের দিকে একটু নেশা করে ফেরেন বলে রাতের খাওয়ারও কিছু ঠিক থাকে না। কোনওদিন খেলেন, কোনওদিন এসেই শুয়ে পড়লেন।

দোকানের সস্তা গুঁড়ো চা। দাম খুবই কম। চা'টার একটাই গুণ, একটুখানি চায়েই কড়া রক্তবর্ণ লিকার হয়। তাতে একটু চিনি আর এক কোটা দুধ ফেলে দেন বিপদনাশিনী। চায়ের কষে জিব, কণ্ঠা সব তেতকুটে হয়ে যায়। আর সেটাই ভারি উপভোগ করেন তিনি।

বিপদনাশিনীর কোনও কাজের লোক নেই। ঠিকে ঝি বা রান্নার

মেয়েটা তাঁরই নাতনি। তিনি এত কুচ্ছিৎ, তাঁর গর্ভে তো সুন্দরের আসার কথা নয়। তবু শর্মিষ্ঠা ভারি সুন্দর হল। চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকতেন বিপদনাশিনী। ঘুঙুর শর্মিষ্ঠার চেয়েও সুন্দর। তেমনি লেখাপড়ায় ভাল, কেমন ফটাফট ইংরেজি বলে।

এখন আর বিপদনাশিনীর কোনও ভগবান নেই। আগে অনেক ভগবান ছিল তাঁর। বছরে পাঁচ-সাতটা ষষ্ঠী করতেন। মনসা, অন্নপূর্ণা, বারের ঠাকুর, সন্তোষী মা, শীতলা মা, শিবঠাকুর, পুজো করে যেন আশ মিটত না। কত যে উপোস-কাপাস করতেন কুমারীজীবনে তার ঠিক নেই। ঠাকুরের পটে আর মূর্তিতে ছয়লাপ ছিল তাঁর বাপের বাড়ির ঠাকুরঘর। বিয়ের পর জানলেন তাঁর স্বামী ওসব পছন্দ করেন না। একদিন রান্নাপুজোর আয়োজন দেখে ভারি বিরক্ত হয়ে বললেন, "খেটেখুটে তোমার অন্নবস্ত্রের জোগাড় করছি আমি, আর তুমি পুজো দিচ্ছ ওইসব নিষ্কর্মা ঠাকুর-দেবতাদের? ওরা কি তোমাকে খাওয়ায়? পুজো দিতে হলে আমাকেই তো দেওয়া উচিত। আমার ওপর আবার ভগবান কে আছে?"

শুনে প্রথমটায় শিহরিত হলেও পরে বিপদনাশিনী ধীরে সুস্থে ভেবে দেখেছেন, মিহিরের কথা মিথ্যেও নয়। তিনি তো একজন বোকা মানুষ। এই দুনিয়ার কিছুই কি তিনি বোঝেন? আর শাস্ত্রেও তো বলেছে, স্বামীর ওপর ভগবান নেই। কিন্তু সংস্কারবশে এক ঝটকায় সব ছাড়তে পারলেন না। লুকিয়ে-চুরিয়ে একটু-আধটু পুজো-আচ্চা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু শিবরাত্রি করতে গিয়ে ফের ধরা পড়ে গেলেন। মিহির তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বললেন, "দেখো, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বা প্লাম্বার মজুরি নেয়, ঝি মাইনে নেয়, দোকানদারকে জিনিসের দাম দিতে হয়, কিন্তু তোমার ওসব ফালতু ঠাকুরদেবতা কোন সার্ভিসটা দেয় বলো তো! তাদের কেনই বা ভোগ চড়াবে, আর কেনই বা প্রণামী দেবে? যারা ঠাকুরদেবতা মানে না তারা কি কিছু খারাপ আছে?"

এসব কথাও খুব যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছিল বিপদনাশিনীর। কাজেই মনে দ্বিধা নিয়েই তিনি পুজো-আচ্চা একরকম ছেড়েই দিলেন। তবে ভগবানের জায়গায় স্বামীকেও ঠিক বসিয়ে উঠতে পারলেন না। ওই জায়গাটা একটু ফাঁকা রইল।

ভগবান ছাড়াও জীবন বেশ কেটে যায় কিন্তু। তেমন কোনও অসুবিধে হয় না তো! আর উপোস করেন না, ব্রতপাঠ করেন না, মঙ্গলচণ্ডী নেই, বারের ঠাকুর নেই, সত্যনারায়ণ নেই, রান্নাপুজো নেই। এবং এসব ছাড়াও দিব্যি তো কেটে যাচ্ছে জীবন।

শ্বশুরমশাই মারা গেলে মিহির অশৌচ পালন করলেন না। শ্রাদ্ধও হল না। সেটাও বেশ মেনে নিলেন বিপদনাশিনী।

বিপদনাশিনীর প্রথম সন্তান তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা যখন জন্মাল তখন তিনি অবাক। তাঁর মতো কুচ্ছিতের গর্ভে এমন ফুটফুটে একটা বাচ্চা জন্মাতে পারে এ যেন রূপকথার গল্প। মেজো ননদ বাচ্চা দেখতে এসে বড় শ্বাস ফেলে বলেছিল, বাঁচলাম বাবা। ফুটেছে। ভেবেছিলাম একটা কেলেকুষ্টি জাম্বুবান জন্মাবে, নাক মুখ চোখ বোঝাই যাবে না ভাল করে।

দু'বছর পরে ছেলে। সেও যেন অবিশ্বাস্য রূপকথার জগৎ থেকে আসা রাজপুরুষ।

নিজের সৌভাগ্যকে যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না বিপদনাশিনীর। দু'টি ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। মনে হত, এরা কেউ আমার সন্তান নয়, রাজবাড়ির চুরি করা দুটো ছেলেমেয়েকে আমার কাছে ফেলে গেছে কেউ। আমি তো দাসী মাত্র।

ওই দাস্যভাবই বিপদনাশিনীর স্বভাবসিদ্ধ। ছেলেমেয়েদের আদর সোহাগ শাসন সবই করেছেন, কিন্তু কোথায় যেন তার সঙ্গে মিশে থেকেছে একটু দাসী-দাসী মনোভাব। আর সেটা তার ছেলে এবং মেয়ে ঠিকই টের পেয়ে গেছে। রাজপুত্র আর রাজকন্যা যখন বড় হয়ে টের পায় যে তাদের পালিকা মা আসলে তাদের দাসী তখন মা সম্পর্কে

তিনি অবাক। তাঁর মতো কুচ্ছিতের গর্ভে এমন ফুটফুটে একটা বাচ্চা জন্মাতে পারে এ যেন রূপকথার গল্প। মেজো ননদ বাচ্চা দেখতে এসে বড় শ্বাস ফেলে বলেছিল, বাঁচলাম বাবা। ফুটেছে। ভেবেছিলাম একটা কেলেকুষ্টি জাম্বুবান জন্মাবে, নাক মুখ চোখ বোঝাই যাবে না ভাল করে।

www.allbdbooks.com

একজন বিএ পাস মহিলা এটাও বিপদনাশিনীর মনে থাকত না।

ছেলে দিল্লিতে বড় চাকরি করে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বেহালায়। ওদের অন্যরকম জীবন। মাঝে মাঝে বিপদনাশিনীর এরকম মনে হয়, খুব মনে হয়, ওরা যেন তাঁর সন্তানই নয়। তিনি অন্য কারও সন্তান মানুষ করেছেন। এরকম মনে হওয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয় নয়। কিন্তু বিপদনাশিনীর তেমন মন খারাপও হয় না।

এ পাড়ায় একজন অঙ্কের ম্যাজিশিয়ান থাকেন। সবাই বলে লম্বা গোপাল। আসল নাম অবশ্য কৃষ্ণগোপাল, কিন্তু বেজায় ঢ্যাঙা বলে লোকে ওই নাম দিয়েছে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ছিলেন। দেশ-বিদেশের মেলা ডিগ্রি। রিটায়ার হওয়ার পর এখন শখ করে ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখান। কিন্তু যাকে তাকে নেন না। ভাল ছাত্রছাত্রী ছাড়া তাঁর কাছে ঘেঁষবার উপায় নেই। তাঁর সাফ কথা, ঘষামাজা করার মতো সময় নেই বাপু। বিদ্যে হরির লুটের জিনিস নয়।

ঘুঙুরকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন বিপদনাশিনীই। এঁদের সঙ্গে বিপদনাশিনীর সম্পর্ক অনেকদিনের। এ বাড়ির দুর্গাপুজোয় বিপদনাশিনীকে মায়ের ভোগ রাঁধবার জন্য ডাকা হয়। সুতরাং কৃষ্ণগোপালের ক্লাসে ভর্তি হতে ঘুঙুরের অসুবিধে হয়নি। শুধু ওকে বলেছিলেন, "তোমার চেহারা-ছবি যা দেখছি তাতে আবার সিনেমা সিরিয়ালে নেমে পড়বে না তো মা? অন্য দিকে মন হলে কিন্তু অঙ্ক শেখা মুশকিল।

শুনে বিপদনাশিনীর বুকের ভিতরটা যেন অহংকারে ঝকমক করে উঠল। তিনি যেমনই হোন, নাতনিটা তো পরির মতো সুন্দর।

সেই থেকে সপ্তাহে একদিন, শনিবার লেক গার্ডেনসে পড়তে আসে ঘুঙুর। সকালে ঘণ্টা দুয়েক অঙ্ক শেখে, তারপর দিদিমার সঙ্গে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলে ফিরে যায়। এইটুকুই যেন বিপদনাশিনীকে ভরে দেয়, উপচে দেয়। মিহির যদি সকালে শুধু একবার বলেন, "আঃ, চা-টা আজ বড় ভাল হয়েছে তো! তাহলেই সারাটা দিন বিপদনাশিনী যেন আনন্দে ভেসে যান।

মানুষের খুশি হতে কত কী লাগে! বিপদনাশিনীর সেই তুলনায় কিছুই তো লাগে না। একটা কথা, একটু হাসি, সামান্য একটু তোয়াজের কথা হলেই বিপদনাশিনীর হেউ-ঢেউ।

আগে নাতনিটার জন্য নানা রকম রাঁধত বিপদনাশিনী। মুর্গির তন্দুরি, চিংড়ির মালাইকারি, জাফরানি ভাত, বিরিয়ানি, চিতলপেটি। আর বিপদনাশিনীর রান্নার কথা চেনা-জানা সব মানুষই খবর রাখে। ঘুঙুর তৃপ্তি করেই খেত, ভালও বলত। কিন্তু বিপদনাশিনী বুঝতে পারতেন, ভাল বলছে ঠিকই, কিন্তু ওর মুখটায় কোনও আলো ফুটছে না। বিস্ময় নেই, অবাক হওয়া নেই, অপ্রত্যাশিত বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ঘুঙুর খুশি না হলে যে তাঁর রন্ধনবিদ্যাই জলে যায়! একদিন সাদা ভাত রাঁধলেন সঙ্গে ছোলা আর ইলিশের মুড়ো দিয়ে কচুর শাক, কাঁটাচচ্চড়ি, সর্ষে আর নারকোল দিয়ে মানকচু বাটা, আর ঝাল গরগরে করে শুঁটকি মাছ। খেতে বসেই ঘুঙুর অবাক, "ও দিদিমা, এই সবুজ হালুয়াটা কীসের?" বিপদনাশিনী শুধু হাসলেন।

ঘুঙুর খুব ভয়ে ভয়ে একটু খেল, চোখে মুখে সন্দেহ-দ্বিধা-আইডেন্টিটি খুঁজে বার করার চেষ্টা এবং তারপরই সেই বিস্ময়টা। দপ করে আলোটা জ্বলে উঠল মুখে, ফ্যান্টাস্টিক তো। আগাগোড়া চেটেপুটে খেয়ে উঠল সেদিন।

সেদিন ঘুঙুরের মুখ দেখে বিপদনাশিনী অমরত্বের আভাস পাচ্ছিলেন। অমরত্ব কেন? তার কারণ, এই যে বিস্ময় সৃষ্টি হল, এই নতুন দেশের খোঁজ পেল ওর জিভ, এটা ও ভুলবে না। বড় হয়ে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে দিদার রান্নার গল্প করবে, নাতি-নাতনির কাছে করবে। আর ওইভাবেই অমর হতে থাকবেন বিপদনাশিনী।

আজ সাদা টপ আর লাল রঙের একখানা মিনি পরে এসেছে ঘুঙুর। হাতে কাঠের বালা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

"হ্যাঁ রে, বেশি অঙ্ক কষলে নাকি শরীর শুকিয়ে যায়!"

"ভ্যাট, কে বলেছে তোমাকে ওসব কথা?"

"অঙ্ক তো রসকষহীন সাবজেক্ট, তাই বলছিলাম।"

"অঙ্ক রসকষহীন তোমাকে কে বলল? অঙ্কের মতো এত ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট আর কী আছে বলো তো!"

বিপদনাশিনী সহজেই হার মেনে নেন। হার মানেন বলেই তাঁর তেমন কোনও শত্রু নেই।

"একটা কাণ্ড ঘটেছে, বুঝলে দিদু?"

"কী কাণ্ড রে?"

"আমি তোমার নামটা বন্ধুদের কাছে বলে দিয়েছি।"

"ও মা! তাই! সবাই হ্যাক ছিঃ করল তো! বলতে গেলি কেন বোকা কোথাকার?"

"ভাবলাম স্কুলে পাঁচটা ঋতুপর্ণা, আটটা সুদেষ্ণা, গোটা দশেক রিয়া, পাঁচটা পূজা, প্রিয়াঙ্কা আর দীপান্বিতাও বেশ কয়েকজন। শুনে শুনে কান পচে গেল। তাই আজ বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম বিপদনাশিনী নামটা কেমন রে? প্রথমটায় সবাই একটু ঠোঁট বেঁকাল বটে, পরে কিন্তু অনেকেই স্বীকার করল যে নামটা ভারি অফবিট। আর একটা হ্যাং আছে। শুনলে ভুল হয় না। তখন আমি বলে দিলাম এটা আমার দিদিমার নাম।"

বিপদনাশিনী হেসে বললেন, "আহা, এটা আবার একটা নাম! ঠাকুমা আদর করে রেখেছিল অবশ্য।"

"আমার নামটাই কীসের ভাল বলো! ঘুঙুর একটা নাম হল বাপু! ড্যান্সারদের পায়ে থাকে।"

"খারাপ নয়। নামটার মধ্যে একটা ঝুমঝুমি আছে।"

"ছাই আছে। যাই বলো, নামটা আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

বিপদনাশিনীর মোবাইলটা বাজছিল। ব্যাঙের ডাকের মতো কটর-কটর একটা আওয়াজ। অনেক পুরনো সেট। পিছনের ঢাকনাটা আটকায় না বলে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকে রাখতে হয়।

ঘুঙুর বলে, "আচ্ছা, এই আদ্যিকালের মোবাইলটা রেখেছ কেন বলো তো! একটা নতুন ভাল সেট কিনতে পার না?"

"ওরে, ওতেই আমার বেশ কাজ চলে যায়।"

"কিন্তু স্ক্রিনটা তো স্ক্র্যাচ পড়ে পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে! তার ওপর রাবার ব্যান্ড পরিয়ে রেখেছ। লোকের সামনে এটা বের করো কী করে? দাঁড়াও মাকে বলে তোমার জন্য একটা দারুণ সেট কিনে দেব।"

"রক্ষে কর বাপু। এটাতেই আমার দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে। আজকাল নতুন সব ফোনে হাজারটা করে ফিচার। ওসব আমি বুঝতেও পারব না।"

ফোনটা নিয়ে অন করার আগে নম্বরটা দেখলেন বিপদনাশিনী। না, চেনা নম্বর নয়। অচেনা কে আবার ফোন করল তাঁকে?

"হ্যাঁ, বলুন।"

ওপাশ থেকে একজন যুবকের ভদ্র নম্র গলা পাওয়া গেল, "দিদিমা, ফোনটা একটু ঘুঙুরকে দেবেন? আমি ঘুঙুরের বন্ধু।"

বিপদনাশিনী খুব বোকা বটে, কিন্তু তিনি মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ। ঘুঙুরের কাছ থেকে চট করে দূরে সরে একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে বললেন, "তুমি ঘুঙুরের বন্ধু? নাম কী তোমার?"

"পার্থ।"

"পার্থ বললে ঘুঙুর কি তোমাকে চিনবে?"

গলায় একটু দ্বিধা ধরতে পারলেন বিদপনাশিনী। ছোঁড়াটা বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি যদি ঘুঙুরের বন্ধু তাহলে ওর মোবাইলেই তো ফোন করতে পারতে।"

"হ্যাঁ। তবে আমার পুরনো মোবাইলটা হারিয়ে যাওয়ায় অনেক নম্বর মিসিং। সেইজন্যই আপনার ফোনে—

"কিন্তু ভাই, আমার ফোন নম্বর তুমি পেলে কোথায়?"

"আপনার নম্বরটা ঘুঙুরই আমাকে দিয়েছিল।"

"কেন বলো তো! আমার নম্বরে তোমার কী কাজ?"

"দিদিমা, প্লিজ, ঘুঙুরকে একটু দিন, জরুরি দরকার।"

"আমাকে আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও বাপু। তুমি ঘুঙুরের নম্বরটা

পুরনো মোবাইলের সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছ, কিন্তু আমারটা হারাওনি। সেটা কী করে হয়?"

"দুটো মোবাইল থাকলে হয় দিদিমা। আপনি বরং ঘুঙুরের নম্বরটাই দিন, আমি ওর সঙ্গে ডাইরেক্টলি কথা বলে নিচ্ছি।"

"তুমি হয়তো রাগ করবে পার্থ, কিন্তু ঘুঙুরের নম্বরটা আমি তোমাকে দিতে পারব না।"

"আমাকে কি বিশ্বাস হচ্ছে না দিদিমা?"

"তোমাকে চিনি না, জানি না, বিশ্বাস করতে যাব কেন?"

"আচ্ছা দিদিমা, আমাকে বিশ্বাস না হয়, আপনি এক মিনিটের জন্য ফোনটা ঘুঙুরকে দিন। ও যদি না চেনে তাহলে ফোন তো কেটেই দিতে পারে। আমি ওর ক্লাসমেট।"

"ঘুঙুর কোন স্কুলে পড়ে তা জানো?"

ছেলেটা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি যে কেন এত জেরা করছেন!"

"তার কারণ তুমি মিথ্যেবাদী। ঘুঙুরের স্কুল কো-এডুকেশন নয়।"

"আসলে আমি ওর ব্যাচমেট। একই ইয়ারে পাস করেছি। আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে ডিবেট করতে গিয়ে।"

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ঘুঙুর তাঁর দিকে চেয়ে বলে, "কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছ গো দিদিমা?"

বিপদনাশিনী ফোনটা কেটে দিয়ে বললেন, "পাড়ার একটা লোক।"

"তাকে তুমি বকছিলে নাকি? মিথ্যেবাদী না কী যেন বললে!"

"ওরে না। ঠাট্টা করছিলুম। চেনাজানা লোকই।"

"সারা পাড়ায় ফোন নম্বর দিয়ে রেখেছ তো!"

"তা কী করব বল। সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক রেখে চলতে হয় যে। হ্যাঁ রে, একটা কথা বলবি?"

"কী কথা?"

"এ পাড়ায় কি কোনও ছেলেছোকরা তোকে ফলো-টলো করে? পিছনে লাগে?"

ঘুঙুর এখন একখানা গোলাপি রঙের ওপর সাদা ফুল তোলা ম্যাক্সি পরেছে। মানিয়েছে খুব। ভ্রু কুঁচকে বলল, "সে তো সব পাড়াতেই লাগে। ইউজুয়াল নুইসেন্স। কেন বলো তো!"

"ফোনটা করেছিল একটা ছেলে। নাম বলল পার্থ। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।"

ঘুঙুর হেসে বলল, "তাই তুমি বকছিলে ছেলেটাকে? আমাকেই ফোনটা ধরিয়ে দিলে পারতে। আমি এসব এলিমেন্টকে ট্যাকল করতে পারি।"

"পার্থ নামে কাউকে চিনিস?"

মুখটা একটু বেঁকিয়ে ঘুঙুর বলে, "তুমিও না দিদিমা! পার্থ একটা হরির লুটের মতো নাম। সারা দেশে হাজার হাজার পার্থ রয়েছে। আমি অন্তত জনা পাঁচ-ছয় পার্থকে চিনি। ওটা কি কোনও আইডেনটিটি? কী করে বলব এই পার্থ আমার চেনা পার্থদের কেউ কিনা।

"একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় তোকে, তাই চিন্তা হয়।"

"তা বলে কি সঙ্গে সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরতে হবে? ভেবো না, চারদিকে অনেক বদমাশ ছেলে আছে বটে, কিন্তু মেয়েরাও এখন তোমাদের আমলের মতো ভিতু আর লজ্জার পুঁটুলি নয়। এত ভয় পাও কেন?"

"আজকালকার ছোঁড়াগুলোর যে পকেটে পিস্তল থাকে।"

"তুমি একটি বুদ্ধুরাম। ওরা তো একটু গা ঘেঁষতে চায়, তার জন্য পিস্তল লাগে না।"

বিপদনাশিনী খুব একটা নিশ্চিন্ত হলেন না। ঘুঙুর স্নান করতে ঢুকলে তিনি ছাদে উঠলেন এবং চড়া রোদে দাঁড়িয়ে চারদিকটা খর চোখে লক্ষ করতে লাগলেন।

গোবিন্দপুর রোড ছাদ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উত্তর দিকে গলি। থিকথিক করছে লোক। কাকে বাছবেন বিপদনাশিনী? তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে খুব খর চোখে লক্ষ করতে লাগলেন। বলতে গেলে পাড়ার সবাই তাঁর চেনা। বস্তির দিকটায় বদ ছেলে অনেক আছে বটে কিন্তু তারা কখনও উঁচু থাকের মেয়েদের পিছনে লাগে না। নিজেদের পর্যায়ের মেয়েদের সঙ্গেই তাদের আশনাই হয়ে যায়, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলে। সুতরাং ফোনটা করেছে কোনও ভদ্র ঘরের ছেলেই।

গলির ভিতরে কিছুক্ষণ চোখ রেখে সয়ে মিনিট পাঁচেক পর বিপদনাশিনী একটা ছেলেকে দেখতে পেলেন আবির নন্দীদের বাড়ির গায়ে দাঁড়িয়ে এ দিকেই তাকিয়ে আছে। মাঝারি লম্বা, গায়ে সাদাকালো স্ট্রাইপের জামা, পরনে জিন্স। বাঁ হাতে বোধহয় মোবাইল।

বিপদনাশিনীর বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু বাস্তববোধ কম নয়। তিনি পার্থর নম্বরটায় একটা কল করলেন। রিং হতে না হতেই লক্ষ করলেন ছেলেটা বাঁ হাতের ফোনটা তুলে কানে লাগাল।

ওই ছেলেটাই। তিনি ফোনটা কেটে দিয়ে আবিরদের বাড়িতে ফোন করলেন।

বাসবী ফোনটা ধরে বলল, "হ্যালো।"

"বাসবী, আমি বিপদনাশিনী বলছি।"

"হ্যাঁ, মাসিমা, বলুন।"

"দেখো তো মা, তোমাদের বাড়ির গায়ে সাদাকালো স্ট্রাইপের শার্ট গায়ে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে চেনো?"

"কেন মাসিমা, কী হয়েছে?"

"পরে বলব। দেখো তো আগে ছেলেটাকে।"

বাসবী বেরিয়ে এল বারান্দায়, দেখতে পেলেন বিপদনাশিনী। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে কী যেন বললও। ছেলেটা হাত নেড়ে কী একটা জবাব দিল। বাসবী ফের ঘরে ঢুকে গেল।

"না মাসিমা, চিনি না। জিজ্ঞেস করলাম দাঁড়িয়ে আছে কেন। বলল, একজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছু করেছে নাকি মাসিমা?"

"এখনও করেনি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে সন্দেহ হচ্ছিল। চারদিকে যা চোর-ছেঁচ্চোড়।"

"ফোন করে ভাল করেছেন। তবে ছেলেটাকে ঠিক চোর-ছেঁচ্চোড় বলে মনে হল না। একটু যেন টেনশনে আছে।"

ছেলেটা ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে এদিক পানেই আসছে। বিপদনাশিনী বেঁটে মানুষ, নিচু হয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে মুখটা দেখে নিলেন। মনে থাকবে। তিনি যা দেখেন আর যা শোনেন তা সহজে ভোলেন না।

বাথরুমে ঘুঙুরের অনেকক্ষণ সময় লাগে। খাটের বিছানায় ছড়ানো ওর বইখাতা। খাতার একটা খোলা পাতায় শক্ত শক্ত অঙ্ক দেখতে পেলেন বিপদনাশিনী। এইসব অঙ্ক তাঁর এতটুকু নাতনি রোজ কষে। তাঁর আর কোনও ঈশ্বর নেই বটে, কিন্তু খাতায় কষা অঙ্কগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি বিভোর হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে বললেন, তোমরা আমার ঘুঙুরের বন্ধু হয়ে থেকো। প্রত্যেকবার যেন একশোতে একশো পায়।

আচমকা জানলার দিকে চেয়ে একটু অবাক হলেন বিপনাশিনী। ছেলেটার সাহস তো কম নয়। একেবারে বাড়ির উল্টোদিকে সদর দরজার মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে একটু আড়াল রেখে ভাল করে দেখলেন বিপদনাশিনী। চেহারাটা ভদ্রলোকের মতোই। ষণ্ডাগুন্ডা হলেও হতে পারে অবশ্য। আজকাল চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা মুশকিল।

বিপদনাশিনী পর্দাগুলো ভাল করে টেনে দিয়ে ঘরের মধ্যে সরে এলেন। তাঁর যৌবনকালে কখনও কোনও ছেলেছোকরা তাঁর পিছনে লাগেনি। কেন লাগেনি তার বাস্তবসম্মত কারণটা নিষ্ঠুর হলেও, বিপদনাশিনীর জানা আছে। তবে অল্প বয়সের দোষই বলো আর ধর্মই বলো, বিপদনাশিনীর কি ইচ্ছে হত না, ছেলেছোকরারা তার দিকে একটু তাকাক বা বিরক্ত করুক? হত, খুব হত। আর একটু লম্বা হলে, আর একটু ফরসা হলে, আরও একটু দেখনসই হলেই সেই জাদুর জগতের দরজা খুলে যেতে পারত। তবু প্রকৃতির নিয়মে বিপদনাশিনীদেরও যৌবন আসে। বড় অনাদর, বড় উপেক্ষার যৌবন।

তেরো বছর বয়সে চাঁপাডালির বরুণ রায়কে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। আর সে কী দেখা! যেন পথ ভুলে এক দেবদূত নেমে পড়েছিল ধুলোমাটিতে। বরুণ রায় দেখতে কেমন তা সেই বয়সের চোখ ছাড়া বোঝা যাবে না। তেরো বছর বয়সে প্রথম রজোদর্শনের পর যখন দেহে মনে এক অপার্থিব আগ্রাসী খিদে জেগে উঠেছিল তখন বরুণ রায়কে দেখে মনে হয়েছিল তার সব ইচ্ছের পরিপূর্ণতা নিয়ে ওই তো পুরুষটি এসে গেছে। কিন্তু হায়, বরুণ লম্বা ছিপছিপে ফরসা টিকালো নাকের অপরূপ মূর্তিখানি নিয়ে মুখ নিচু করে আনমনে কী যেন ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলে যেত। ভ্রুক্ষেপই করেনি কোনওদিন। কাঁপা-কাঁপা নার্ভাস হাতে তাকে প্রেমপত্রও দিয়েছিলেন বিপদনাশিনী, তাতে নিজের নাম লিখেছিলেন, ইতি মনোমিতা। এক বিশ্বাসী বন্ধুর ঠিকানা দেওয়া ছিল তাতে। বরুণের কোনও জবাব আসেনি। কত পিপাসা নিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে, উন্মনা হয়ে, নিজেকে সদা জাগ্রত রেখে অপেক্ষা করে থাকতেন তিনি। আজ আটান্ন বছর বয়সে অপেক্ষাটা নেই ঠিকই, কিন্তু তাঁর ভিতরকার কোনও প্রকোষ্ঠে বরুণের একখানা মূর্তি আজও বসানো আছে। আজও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন মুহূর্তে ঝোড়ো বাতাসে পাতা-খসে পড়া বসন্তের দিনে আনমনা ছিপছিপে ফরসা বরুণ মাথা নিচু করে হেঁটে চলে যায়।

খুব অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই ঘুঙুরের স্নান সেরে ঘরে আসা টের পাননি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘুঙুর বলল, "এত বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়?"

তটস্থ হয়ে বিপদনাশিনী বলেন, "কে, কার কথা বলছিস?"

"তোমাদের গিরিবালার কথা। অঙ্ক স্যারের ঠাকুমা। একশো চার বছর অবধি বেঁচে ছিল। মাই গড! এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি।"

"আহারে! কী যে বলিস। বড় ভাল মানুষ ছিলেন গিরিবালা।"

"তুমি তো বলবেই। তোমাকে সতী-সাধ্বী না কী যেন বলত, তাই না?"

গিরিবালার বাস্তবিকই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিপদনাশিনী কলিযুগের অতি বিরল সতী-সাধ্বীদের একজন। বিপন্ন প্রজাতি। প্রায়ই বলতেন, এখন তো আর সতী-সাধ্বী খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই বিপদনাশিনীর মতো দু'-চারজন।

কথাটা ওঠায় আজ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন বিপদনাশিনী।

তিন

বহু দিন হল বৃষ্টি নেই। জুলাইয়ের রোদ আগুনের প্রপাতের মতো নেমে আসছে চারদিকে। এই বিষাক্ত দুপুরে এক সদাশয় নিমের ছায়ায় বসে চরাচর দেখছিল সে। ঠিক দেখাও নয়, চেয়ে থাকা। সামনেই বজবজের রেললাইন। একটু আগেই একটা আপ ট্রেন পাস হল। তার কাঁপনটুকু এখনও আবহে রয়ে গেছে।

ওই যে সামনেই গিরিধারীর ছাতু আর ভুজিয়ার দোকান। ক্যানেস্তারার পাত দিয়ে তৈরি একখানা বাঁকাচোরা ঘর। দেখলেই বোঝা যায় এ হল গরিবদের দোকান। মাঝবয়সি ও বহিরাগত গিরিধারী তার খদ্দেরদের পেতলের থালায় ছাতু বেড়ে দিচ্ছে। সঙ্গে চাকা চাকা কাঁচা পেঁয়াজ, একটু আচার আর লোটাভর জল। খদ্দেরদের প্রায় সবাই ঠেলাওলা। তাদের ঠেলাগাড়িগুলো সার-সার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চলচ্ছক্তিহীন।

অদূরে উঁচু দেওয়ালঘেরা এশিয়ান পাইপ লাইনসের বিশাল গোডাউন। ওইখানে তার একটা চাকরি হওয়ার কথা। অ্যাকাউন্ট্যান্টের। বেতন সামান্যই, পাঁচ থেকে সাত হাজারের মধ্যে। পাঁচ না সাত সেটা ঠিক করবে কে তা জানে না মন্দার। শুধু জানে, তেজেন তার জন্য চেষ্টা করছে। শোনা যাচ্ছে, হয়েও যাবে। তবে—

ওই 'তবে' কথাটার মধ্যে যে রহস্য আছে তার কথা সবাই জানে। মন্দারেরও জানা আছে। পরশু অসমাপ্ত ওই প্রশ্নসূচক 'তবে' শুনেই মন্দার বলেছিল, "কত দিতে হবে?"

তেজেন দুঃখের সঙ্গেই বলল, "বেশিই চাইছিল। বলে কয়ে দশ হাজারে রাজি করিয়েছি।

দশ হাজার ন্যায্য বলেই মনে হয়েছিল মন্দারের। টাকাটা জোগাড় করতে তাকে কষ্ট করতে হয়েছে। বাঁ হাতে একটা আংটি ছিল। পিউ দিয়েছিল। সেটা গেছে। শখ করে একটা দামি মোবাইল কিনেছিল, সেটা আঠাশশো টাকায় বিক্রি করেছে। বিক্রি ও বেহাত হয়ে যাওয়া এসব স্মারকের জন্য কোনও খেদ নেই তার। জিনিসের দ্রব্যমূল্য আছে মাত্র।

প্রায় মাসখানেকের এই ঘোরাঘুরি, ধরনা দিয়ে বসে থাকা, অনিশ্চয়তা নিয়ে অপেক্ষা করা আজ শেষ হওয়ার কথা। চাকরিটা, ধরা গেল, যদি হয়ই, তাহলে? তাহলে কী হবে? সামান্য ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে মাত্র। আর তেমন কিছুই হওয়ার নয়। দিন-রাত একটা অসংলগ্ন মনের প্রলাপ শুনে যেতে হবে না হয়তো তাকে। হিসেব-নিকেশে ডুবে থাকার ওই একটা সুফল আছে।

ওই তেজেন আসছে। মন্দারের বুকে একটুও ধুকপুকুনি নেই। চাকরিটা না হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়াই হবে না। ঘাসের ওপর থেকে নিজের শরীরটা টেনে তুলতে গিয়ে বাঁ দিকের মাজায় বাঘের কামড়ের মতো ব্যথাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওইখানেই লাথিটা মেরেছিল সত্যেন। কপাল, মাথা, কনুই, কব্জি এবং হাঁটু কোনও অঙ্গই সত্যেন আর তার দলবলের সমবেত মার থেকে রেহাই পায়নি। আর পুরো কাণ্ডটা দোতলার বারান্দায় মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল পিউ। একটাও কথা বলেনি। একবারও বলেনি, ওরে, তোরা ওকে আর মারিসনি। কেউ জানে না, ওই অনাদরটাই শরীরের মারের চেয়েও বহু গুণ লেগেছিল মন্দারের।

ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছে সে দেখতে হনুমানের মতো। সস্তুর বোন টিকলি একবার তাকে বলেছিল, তুই তো দেখতে একটা হনুমানের মতো। হতকুচ্ছিত। সেই থেকে তার দৃঢ় ধারণা হল, সে বেজায় কুচ্ছিত।

'একস্ট্রাভ্যাগান্ট' শব্দটার মানে বলতে পারেনি বলে ইংরেজির স্যার বিশ্বনাথবাবু গাল দিয়েছিলেন, 'গাধা।' ওই যে নিজেকে গাধা বলে তার বিশ্বাস হল, তা থেকে আজ অবধি মুক্তি হয়নি তার। বাবা তাকে প্রায় প্রত্যহই বলতেন 'অপদার্থ'। মাকে বলতেন, তোমার ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। মন্দার সেই বিশ্বাসে আজও অবিচল আছে। তার কিছু হয়ওনি।

নিজের সম্পর্কে মোটমাট একটা পরিমাপ করে নিয়েছিল সে। দেখতে কুৎসিত, অপদার্থ, আনস্মার্ট, নির্বোধ এবং ফলত উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন। চক্রবর্তীদের প্যাথোলজি ল্যাব-এ একটা ভারি সাদামাঠা কাজ জুটে গিয়েছিল। ব্লাড স্যাম্পল কালেক্ট করা। তার মনে হয়েছিল, তার পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর কী-ই বা হতে পারে। তখন অল্পে খুশি এক ভাগ্যবান যুবক ছিল সে। তেমন কোনও শখ-আহ্লাদ নেই, অন্যকে দেখে নিজের অবস্থাকে ঘেন্না হত না। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে অনেক দূরে দূরে যেতে হত তাকে। চার দেওয়ালের মধ্যে দম বন্ধ করা চাকরিও নয়। ওই সামান্য চাকরিতে বাবা খুশি ছিল না, বোন ঝিনুক নাক সিঁটকাত, কিন্তু সে ছিল ভারি আনন্দে। মাসের শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আসে হাতে, টিএ পাওয়া যায়। তার ওপর ছিল একটু সুনামও। রোগীরা বলত, মন্দার যে রক্ত নেয় টেরই পাওয়া যায় না।

দুর্ঘটনাটা ঘটল ওই রক্ত নিতে গিয়েই। তার জীবনে এরকম ঘটনা এই প্রথম। রায়বাড়ির নামডাক আছে। এদের বাড়ির পুরুষেরা বেশির ভাগই কৃতী। বিরাট বড় বাড়ি, বড় পরিবার। যৌথ পরিবার ভেঙে ভেঙেও এখনও খানিকটা জুড়ে আছে। ওই বিশাল বাড়ির দোতলার একটেরে একটা ঘরে প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন এক অপরূপ মেয়ে। তবে মেয়েদের রূপ দেখে পাগল হওয়ার মতো আহম্মক মন্দার নয়।

মাধুরী দীক্ষিতকে দেখে একটা জার্সি ষাঁড়ের কি কোনও ভাবান্তর হয়? তারও তাই। তুমি সুন্দর আছ তো আছ, তাতে আমার কী? আমি একজন বোকাসোকা অপদার্থ লোক। আমার লোভটোভ নেই, হেলদোলও নয়। চারদিকে লোভনীয় জিনিস কি কিছু কম আছে? দামি

জিনস, বাহারি জামা, ঝিনচাক মোবাইল, এলসিডি টিভি, ল্যাপটপ কম্পিউটার, মহার্ঘ পারফিউম। কিন্তু লোভ করলে কি আমার চলে? আমার সঞ্চার আধো অন্ধকার, অনুজ্জ্বল জীবনের নানা অলিগলি দিয়ে।

রক্ত নেওয়ার পর মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, "হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ।"

"একটুও লাগল না তো!"

মন্দার হেসে বলল, "লাগবে কেন? লাগার তো কথা নয়।"

"আচ্ছা, আমাকে যদি ডাক্তার ইঞ্জেকশন নেওয়ার কথা বলে তাহলে আপনি এসে দিয়ে যাবেন?"

মন্দার ঘাড় কাত করে বলে, "হ্যাঁ। একটা খবর দেবেন।"

"আপনার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দিয়ে যান তো!"

মন্দার দিল।

পিউ বলল, "ইঞ্জেকশনকে আমি বড্ড ভয় পাই।"

"সে তো অনেকেই পায়।"

পিউয়ের টাইফয়েডের সঙ্গে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করছিল ডাক্তাররা। বেশ জটিল ছিল রোগ।

পিউয়ের রক্তে হিমোগ্লোবিন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছিল। ছিল আরও নানা উপসর্গ। সুতরাং ইঞ্জেকশন দিতে বা রক্তের নমুনা নিতে ঘনঘনই মন্দারকে যেতে হত রায়বাড়িতে।

অসুখের জন্য সাদা আর রোগা আর করুণ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। বড় বড় চোখ করে তার দিকে চেয়ে একদিন জিজ্ঞেস করল, "আমার কী হয়েছে বলুন তো? ডাক্তাররা কিছু বলতে চাইছে না। আমি কি আর বাঁচব না?"

মন্দার জানে ডাক্তারদের নিয়মে রোগীদের সব কথা বলতে নেই। সে একটু হেসে বলল, "এসব রোগে আজকাল কেউ মরে নাকি? কত সব আধুনিক ওষুধ বেরিয়ে গেছে বলুন তো!"

"আমি ভাল হব বলছেন?"

"ভালই তো হচ্ছেন। জ্বর তো একটু একটু কমছে। আপনার কাজ হল এখন পুষ্টিকর খাবার খেয়ে যাওয়া।"

নাক সিঁটকে পিউ বলল, "ইস, পুষ্টিকর খাবারগুলো যা খারাপ। মুরগির ডিমের হাফবয়েল, বয়েলড ভেজিটেবল। একজন ফুচকাওয়ালাকে ধরে আনতে পারবেন এই ঘরে?"

"তাহলে যে আমার চাকরি যাবে ম্যাডাম।"

"এটা আর এমন কী চাকরি! যায় তো যাক না।"

"চাকরি গেলে খাব কী ম্যাডাম?"

"আচ্ছা, এটা ছাড়া কি আর চাকরি নেই? আপনি কী পাস বলুন।"

"বায়োসায়েন্স নিয়ে বি.এসসি।"

"অনার্স ছিল না?"

"অনার্স চেয়েছিলাম। রেজাল্ট ভাল ছিল না বলে পাইনি। না, এই ডিগ্রির তেমন বাজারদর নেই।"

চোদ্দো-পনেরো দিন পর পিউয়ের জ্বর যেদিন একশোতে নেমে এল সেদিন একটু বেলার দিকে ফোনটা পেল মন্দার। একটা উচ্ছ্বসিত গলা বলে উঠল, "জানেন, আজ আমার জ্বর প্যারাসিটামল ছাড়াই একশোতে নেমে গেছে?"

"তাহলে তো অসুখ সেরেই গেল ম্যাডাম। ভাল থাকবেন।"

"কিন্তু আপনাকে যে আজ একবার আসতে হবে।"

"আজকে! কিন্তু আজ তো কোনও টেস্ট নেই!"

"আছে মশাই! আজ আমার মা আপনাকে সন্দেশ খাওয়াবে। সেটা টেস্ট করতে হবে না?"

ল্যাবের কাজ সেরে গিয়ে পিউয়ের ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্পও করেছিল সেদিন মন্দার। বালিশে ঠেস দিয়ে বসা রোগশীর্ণা পিউয়ের দু'টি বড় বড় চোখ সেদিন লেহন করেছিল তাকে।

পরদিন সকালেই আবার ফোন, "আচ্ছা মন্দারবাবু, আমি কি আজ একটু বেরোতে পারি?"

শঙ্কিত মন্দার বলে, "না না, আজ নয়। দুর্বল শরীরে মাথা ঘুরে যেতে পারে। ব্যালান্স থাকবে না।"

"কিন্তু ফুচকা বা চুরমুর না খেলে যে আমি আর পারছি না।"

"উঃ, আপনাকে নিয়ে তো পারা যায় না দেখছি! সবে জ্বর রেমিশন হয়েছে এখন অত্যাচার করলে যে বিপদ। এ সময়ে শরীরে ইমিউনিটি কম থাকে।"

হি হি করে শুধু হাসল পিউ।

পরদিন আবার ফোন, "আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?"

"কী মনে হচ্ছে?"

"কতকাল বাইরের জগৎটা দেখা হয়নি। যেন চোদ্দো বছর জেল খাটছি। বাইরে কত কী হয়ে যাচ্ছে বলুন তো!"

"ম্যাডাম, বাইরেটা যা ছিল তাই আছে। মাত্র পনেরো-ষোলো দিনে কী আর এমন চেঞ্জ করবে বলুন!"

"আচ্ছা, লেকটা তো কাছেই। আজ একটু লেকের ধারে গিয়ে বসব?"

"যাবেন?"

"খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু একা কি পারব?"

"না না, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

"কে নিয়ে যাবে বলুন, এ বাড়ির সবাই যা ব্যস্ত। আপনি পারবেন নিয়ে যেতে আমাকে?"

মন্দার একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বলে, "আমি ম্যাডাম? কিন্তু—"

"সাড়ে পাঁচটায় তো আপনার ছুটি, আমি জানি।"

"হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটায় বেরনো যায় বটে। তবে—"

"ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তিন নম্বর গেটে থাকবেন, প্লিজ।"

কেন একটা ভাল ঘরের সুন্দর মেয়ে তাকে এই এতটা লাই দিচ্ছে তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না মন্দারের কাছে, শুধু বিস্ময় ছিল। বাথরুমে গিয়ে সে আয়নায় ভাল করে তার মুখশ্রী অবলোকন করল। তার বরাবর যা মনে হয় আজও তাই মনে হল। সে দেখতে অতীব কুৎসিত। তার ওপর সে অপদার্থ এবং বোকা এবং যাচ্ছেতাই একটা লোক। পিউ যদি তাকে ভালবেসে ফেলে থাকে তাহলে ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। এরকম হওয়া উচিত নয়।

খুব আস্তে আস্তে ধীর পায়ে শরতের ঈষদুষ্ণ বিকেলে লেকের আলো ও ছায়ায় চিত্রিত পথটি ধরে বুদ্ধমন্দির পর্যন্ত হেঁটেছিল তারা। মন্দার ভাবত সে বোধহয় কথাই বলতে জানে না। কিন্তু সেদিন তার গোপন পেটিকা থেকে কত অবরুদ্ধ কথা যে গুটি ছেড়ে প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ে এল তার হিসেব নেই।

আর পিউয়ের চোখ ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধতর, মায়ার অঞ্জনে মাখামাখি হয়ে তার সর্বাঙ্গে চন্দন মেখে দিয়েছিল বুঝি।

"অনেক হেঁটেছ, আজ আর নয় পিউ। ফিরে চলো।"

"একটু বসি না দু'জনে। বুদ্ধমন্দিরটা যে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

"বাড়িতে চিন্তা করবে না?"

পিউ ফোন তুলে দেখাল, "এটা আছে কী করতে? মোবাইল আবিষ্কার হয়ে অবধি দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা আর নেই। বুঝলে মশাই?"

পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকাটাও সেদিন ছিল কত বাঙ্ময়। মন ভরে গেলে কথার দরকার হয় না।

মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছিল পিউ। একদিন ফোনে বলল, "তুমি বড্ড মুখচোরা। ভয় হয়, তুমি বোধহয় কোনওদিনই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে উঠতে পারবে না। প্রস্তাবটা যদি আমিই দিই?"

"কিন্তু পিউ, একটু ভেবে দেখো, তুমি কত বড় বাড়ির মেয়ে—"

"আমি শুধু একটা মেয়ে মন্দার।"

কোনও ঘাপলাই ছিল না। মন্দারের বয়স ছাব্বিশ প্লাস, পিউয়ের চব্বিশ। রেজিস্ট্রির পর ড্যাং ড্যাং করে পিউকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতেই গিয়ে উঠতে পারত মন্দার। স্বাভাবিক নিয়মে তাই হওয়ার কথা। কিন্তু একজন কাপুরুষ জানে যে সে একজন কাপুরুষ। বাড়িতে

এই দুঃসাহসিক ঘোষণাটা করার মতো বুকের পাটাই তার ছিল না। আর পিউও জানত আইন তাদের পক্ষে হলেও তার প্রভাবশালী এবং পয়সাওয়ালা পরিবার হাঙ্গামা বাধাবেই। তার ভিতু প্রেমিকটিকে ওইরকম পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই ছিল না তার।

রেজিস্ট্রির পর, সুতরাং কাউকেই কিছু না জানিয়ে তারা পুরী পালিয়ে গেল। উতরোল সমুদ্রের ধারে সে কয়েকটা স্বপ্নের মতো সুখের দিন। টাকার অফুরন্ত জোগান বেরিয়ে আসত পিউয়ের ব্যাগ থেকে। বেশ কয়েকটা সাবেক আমলের ভারী গয়নাও ছিল তার। পুরী ফুরোল। তারপর রানিগঞ্জে পিউয়ের সদ্য বিয়ে হওয়া এক বান্ধবীর বাড়িতে কয়েক দিন। সেইখানে একটু অস্বস্তিকর ছিল বান্ধবীর শাশুড়ির চোখা চোখা সব প্রশ্ন।

রানিগঞ্জও ফুরিয়ে গেল। ফুরোল পিউয়ের অফুরন্ত টাকা।

"এবার কী হবে?"

"চিন্তা কী? আমার চাকরিটা তো আছে। টালিগঞ্জেই ফিরে যাই।"

"তোমার চাকরিটা নেই মন্দার। চক্রবর্তীদের সঙ্গে আমার বাবা-কাকাদের ভীষণ খাতির।"

"তাহলে?"

"ফিরতে তো হবেই।"

যে উদ্দীপনার সঙ্গে নিষ্ক্রমণ হয়েছিল তাদের, ফেরাটা হল তেমনই কুণ্ঠাজড়িত।

এক ম্লান বিকেলে টালিগঞ্জের বাড়ির বেল টিপতেই মা এসে দরজা খুলে তাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটা ঝটকা মেরে ঘুরে ভিতরের ঘরে চলে গেল। শাঁখ না, উলুধ্বনি না, একটা মৃদু দায়সারা অভ্যর্থনা পর্যন্ত না। দু'জন অপরাধীর মতো ঘরে ঢুকে যৎসামান্য মালপত্র নিয়ে বসে রইল শুকনো মুখে। বড়ই লজ্জা পাচ্ছিল মন্দার, আর পিউয়ের চোখ জ্বলছিল।

অবশ্য বেশিক্ষণ একলা থাকতে হয়নি। পাড়ায় খবর রটে গেছে চোখের পলকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই পলাতককে দেখতে ভিড় করে এল পড়শিরা। ক্লাবের ছেলেরা এসে ভরসা দিল, কোনও চিন্তা নেই। আমরা আছি। মাসিমা মেসোমশাইকে আমরা বোঝাব।

কয়েকজন ভিতর বাড়িতে ঢুকেও গেল। বিস্তর কথাবার্তা চেঁচামেচি হতে লাগল ভিতরে।

বাড়িতে প্রবল অশান্তি ও অপমানের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বটে। তবে সংসারের নিয়মেই সব থিতু হল। কিন্তু সেই ডামাডোলে আর এক অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশকারীও ঢুকে বসেছিল ঘরে। সেটা হল অর্থনীতি। মন্দারের চাকরিটা নেই।

তখনও ভালবাসার অ্যাড্রেনালিন-প্রবাহ থেমে যায়নি বলে দু'জনেই লেগে পড়েছিল টিউশনিতে। প্রথম প্রথম তো মনেই হয়, আমরা করব জয়। কিন্তু লড়াইয়ের বহরটা বড় হয়ে গেলে জয়-পরাজয়ে নিষ্পত্তিও ক্রমে দিগন্তে সরে যায়। মন্দার একদিন খালপাড়ের এক মস্তানের ঠেকে সন্ধেবেলা হাজির হয়ে গিয়েছিল।

"আমি স্মাগলিং করতে চাই।"

টোপকা হাসেনি। শুধু বিস্মিত চোখ তুলে বলেছিল, "স্মাগলিং? কীসের স্মাগলিং?"

"যে কোনও জিনিসের।"

"সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমার কাছে কেন?"

"আমি খবর পেয়েই এসেছি, আপনি ইচ্ছে করলে হয়ে যাবে।"

টোপকা কথাই বলেনি। একটা টিনের পাত্রে কেরোসিন তেল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাতের তেল-কালি ঘুচ্ছিল। একটা কালচে ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে বলল, "তোদের একটা মুশকিল কি জানিস? তোরা ভাবিস মাথার কাজ ছাড়া আর সব কাজই সোজা। নেমে পড়লেই হল। খুব হিন্দি সিনেমা দেখিস বুঝি?"

"না, তা ভাবি না।"

"এই যে অটোটা সারালাম এতক্ষণ ধরে, একটা আইআইটি-র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে নিয়ে আয় তো, দারিয়ে দেখাক দেখি।"

মন্দার একটু দমে গেল।

"কোনও কাজটাই সোজা নয়। পুলিশের গুঁতো খেয়েছিস কখনও?

মন্দার হেসে বলল, লাগবে কেন? লাগার তো কথা নয়।

যখন পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে পেটাবে, বিচিতে লাথি মারবে পারবি সহ্য করতে? শচীন মাস্টারের ছেলে, বামুন, ভদ্রলোক, তখন তো হড়হড় করে সব কথা কবুল করে পায়ে ধরবি। আর যখন রাইভ্যাল পার্টি বোমা মারবে, গুলি চালাবে, চপার ড্যাগার পেটে বুকে ঢুকিয়ে দেবে তখন?"

মন্দার তবু জেদ ধরে বলেছিল, "আমি পারব।"

"নতুন বিয়ে, বউটাকে বিধবা করতে চাস কেন? ফোট শালা।"

বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে সোনারপুরের কাছে একটা স্কুলে প্যারা টিচারের চাকরি জুটিয়েছিল পিউ। আর একগাদা টিউশনি। ইংলিশ মিডিয়মের ছাত্রী বলে একটু সুবিধে ছিল তার।

বিয়ের চার-পাঁচ মাসের মাথায় নারদমুনির অনুপ্রবেশ। দু'জনের একটু-আধটু মেজাজ খারাপ হতে শুরু করে। ছ'-সাত মাসের মাথায় কথা কাটাকাটি। তারপর রাগারাগি। প্রায়ই রাতে তাদের ঝগড়া লাগত। চলত মধ্যরাত অবধি। কান্নাকাটি, খাওয়া বন্ধ। একদিন ভাব-ভালবাসার সময় দু'জনে নির্বোধের মতো সিদ্ধান্ত নিল, তাদের এই খিটিমিটি বন্ধ করতে হলে একটা সন্তান হওয়া দরকার। তাহলেই ফের দু'জনের ভালবাসা উথলে উঠবে। আর তাই পৌনে দুই বছরের মাথায় তাদের দাম্পত্যে ষষ্ঠী ঠাকরুন ঢুকে পড়লেন। তাদের একটা মেয়ে হল। সাত মাসে। প্রিম্যাচিওর।

রোগা, ক্যাংলা, অপুষ্ট, কাঁদবারও শক্তি নেই এমন দুর্বল বাচ্চাটিকে দেখে সস্তার নার্সিংহোমের মাঝারি গাইনি কোনও ভরসাই দিলেন না। শুধু বললেন, খুব যত্নে রাখবেন।

ওই মেয়েটির সঙ্গেই শনিঠাকুরও ঢুকে পড়লেন দু'জনের মাঝখানে।

পিউ কাজকর্ম ভুলে বাঘিনীর মতো মেয়েকে আগলে রইল। কাউকে ঘেঁষতে দিত না কাছে, ইনফেকশনের ভয়ে। বুকের দুধ টানারও শক্তি ছিল না বাচ্চাটার, সলতে দিয়ে খাওয়াতে হত। ঠান্ডা লাগার ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। আর এই প্রবল আদিখ্যেতা নিয়ে অশান্তি।

শাশুড়ির নিদান ছিল সর্ষের তেল গরম করে বাচ্চাটাকে ভাল করে মালিশ করার। ধমকে দিয়েছিল তাকে পিউ। কিন্তু সে বাথরুমে যাওয়ার ফাঁকে শাশুড়ি চুপ করে এসে মালিশ করায় পিউ রাগে বেহেড হয়ে শাশুড়িকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ায় তিনি পড়ে যান। বেকায়দায় পড়ায় তাঁর বাঁ হাতের হাড় চুরমার হয়ে যায়। আর এর পরই তাকে রাগে অন্ধ হয়ে চড়থাপ্পড় কষিয়েছিল মন্দার। শ্বশুর বলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে।

মেয়ের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে আর নিজের হাতব্যাগটা শুধু নিয়ে পিউ লজ্জার মাথা খেয়ে বাপের বাড়ি ফিরে গেল।

তেজেনের মুখে কোনও উজ্জ্বলতা নেই, হাসি একটা আছে বটে, তবে সেটা শিল্পকর্ম হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভিতরকার হাসি নয়, মুখের হাসি। কাছে এসে বলল, "চল, চা খাবি?"

মন্দার এই আমন্ত্রণের অর্থও বুঝতে পারছে।

বলল, "চল।"

কাছেই রাস্তার উল্টোদিকে পল্টুর দোকান। চালাঘর এবং হাঘরে চেহারা। তবে চা খারাপ বানায় না।

বসার পর তেজেন বলল, "শালা সুপারভাইজারের একজন ক্যান্ডিডেট আছে। আগে জানলে এতদিন তোকে ঝুলিয়ে রাখতাম না।"

মন্দারের একটুও হতাশ লাগল না, মনখারাপ হল না। সে যেমন আনমনে গ্রীষ্মের দুপুরের দৃশ্যাবলি দেখছিল তেমনই দেখতে দেখতে বলল, "তোর তো দোষ নেই।"

"লোকটা সুপারভাইজারের শালা।"

এটাও মন্দারের কাছে কোনও সংবাদ নয়। চা খেয়ে সে উঠে পড়ল, বলল, "চলি রে!"

তেজেন নিজেকে অপরাধী ভাবছে, তাই বলল, "কিছু মনে করিস না ভাই। ব্যাড লাক বলে মেনে নে।"

মন্দার বলল, "আরে না, ঠিক আছে।"

তার বাঁ দিকের হিপ পকেটে কুড়িটা পাঁচশো টাকার নোট। টাকাটা বেঁচে গেল। চড়া রোদের এই দুপুরে তার কোথাও যাওয়ার নেই। টিউশনি সব সেই সন্ধের পর। সে হাঁটতে লাগল। মাজার ব্যথাটা হাঁটলে একটু কম থাকে। বসলে পরে ব্যথার জায়গাটায় বোধহয় রস জমে যায়।

মোবাইলের সিম কার্ড পাল্টে ফেলেছিল পিউ। তবু মন্দার মাঝে মাঝে তার পুরনো নম্বরে ডায়াল করে যান্ত্রিক নারীকণ্ঠটি মন দিয়ে শুনত, আনরিচেবল। কিংবা সুইচড অফ। বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করার মতো সাহসী মন্দার ছিল না। তবে মাঝে মাঝেই বুক মন্থন করে তার রোগা, ছোট্ট, দুর্বল মেয়েটার কথা খুব মনে পড়ত। একবার মেয়েটাকে চোখে দেখে আসার জন্য ভারি ইচ্ছে হত তার। কিন্তু ও বাড়িতে যে ঢোকার উপায় নেই। তার নিজের বাড়িতেও আবহাওয়া বিস্ফোরক। মায়ের হাতে জটিল ফ্র্যাকচার যে ভোগান্তি ঘটাল তার চেয়ে অনেক বেশি ওগরাল পিউয়ের ওপর বিষ-বিদ্বেষ। থানায় পিউয়ের নামে এফআইআর করারও পরামর্শ দিয়েছিল কেউ কেউ। পাড়ার লোক জানল যে, পিউ তার শাশুড়ির হাত ভেঙে দিয়ে গেছে।

যেটা আশ্চর্যের বিষয় সেটা হল, পিউ চলে যাওয়ার পর ছ'মাসের ভিতরে ডিভোর্সের কোনও মামলা করল না। চারশো আটানব্বইও না। এতে ক্ষীণ একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল মন্দারের মনে। হয়তো পিউ ফিরে আসার পথ খোলা রাখছে। হয়তো এত কষ্টের পরও ভালবাসাটা একেবারে মরে যায়নি। পিউ তার সুটকেসটাও রেখে গেছে। সেটাও হয়তো একটা অস্তিবাচক ইঙ্গিত। ফিরে আসবে বলেই নিয়ে যায়নি। ফিরে আসার ইচ্ছে না থাকলে নিশ্চয়ই নিজে এসে বা লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেত। এইসব নানা উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে সাহস সঞ্চয় করতে করতে প্রায় পৌনে দু'বছর কেটে গেল। যখন আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না, মেয়ে আর পিউয়ের জন্য প্রবল উদ্বেগ যখন তাকে পাগল করে দিচ্ছিল তখন সে একদিন খুব সাহস করে ও বাড়ির ল্যান্ডলাইনেই ফোন লাগাল।

একটা খড়খড়ে নারীকণ্ঠ প্রায় ধমকে উঠল, "হ্যালো! কাকে চাই?"

"পিউ আছে?"

Advt

National Institute of Bank Management, Pune **PGPBF 2012-14**

NIBM was established in 1969 by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, as an autonomous apex institution, with the mandate of playing a proactive role of "think-tank" of the banking system. The NIBM is an autonomous academic institution governed by a Board, its highest policy-making body. The Governor of the Reserve Bank of India (the central bank of the

managers for the banking and financial services industry. The two-year PGPBF is designed as a contemporary, rigorous, innovative and practical source of management education.

Students admitted to the post-graduate programme are expected to have scholastic achievements in different disciplines such as arts,

"আপনি কে?"

"পিউকে বলুন আমি টালিগঞ্জ থেকে চ্যাটার্জি বলছি।"

"কিন্তু এই ফোন তো ওকে দেওয়া যাবে না। ও দোতলায় থাকে। মোবাইলে ফোন করুন।"

"কিন্তু নম্বরটা তো জানা নেই!"

"সে আমিও জানি না।"

বলেই ফোনটা ঝট করে কেটে দিল। কোনও কাজের মেয়েই হবে। ও বাড়িতে অনেক কাজের লোক।

ভিতু লোকের সমস্যার অবধি নেই। কয়েকদিন বাদে আবার বুকের গ্যাস বেলুন ফুলিয়ে ফোন করেছিল মন্দার। একটা বজ্রগম্ভীর গলা 'হ্যালো' বলতেই আঁতকে উঠে ফোন ছেড়ে দিয়েছিল।

এই যে প্রকৃতির নিয়মে দুনিয়ায় হাজার হাজার শিশুর জন্ম হচ্ছে তাতে তো মন্দারের কোনও হেলদোল ছিল না এতদিন। কিন্তু যেই মাত্র তার মেয়েটা জন্মাল, যাকে সে সৃষ্টি করেনি, নাক মুখ চোখ গড়ে দেয়নি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেনি, যে জন্মেছে মন্দারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক প্রাণ-বিদ্যার ক্রম অনুযায়ী, তার প্রতি হঠাৎ এক আশ্চর্য বোধ জন্মাল, এ আমার মেয়ে! পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শিশুর চেয়ে আলাদা, ও বিশেষ, ও আমার। তার ওপর মেয়েটা সময়ের আগে জন্মে যাওয়ায় ভারি রুগ্ণ, ক্ষীণজীবী, কান্নার শব্দটা পর্যন্ত ভাল করে শোনা যায় না। বড় মায়া জন্মাল তার।

হিসেব মতো মেয়েটার যখন সাড়ে তিন বছর বয়স তখন অনেক অপেক্ষার পর মন্দার ঠিক করল, যা হয় হবে, একবার মেয়েটাকে একটু চোখের দেখা না দেখে এলে তার মনের অস্থিরতা কমবে না। অনেক মাথা খাটিয়ে সে স্থির করল, পিউয়ের ফেলে-যাওয়া সুটকেসটা পৌঁছে দিয়ে আসার একটা অছিলায় গিয়ে হাজির হলে হয়। আর এতদিন পরে নিশ্চয়ই মানুষের মারমুখো রাগ অনেকটাই পড়ে যাওয়ার কথা।

সময়টা অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছিল সে। যে সময়ে বাড়িতে পুরুষদের সংখ্যা কম, রাস্তাঘাটেরও সুনসান অবস্থা, সেই দুপুরবেলা। বেলা তিনটে নাগাদ কাঁপা বুকে একটা ট্যাক্সিতে চেপে সে তার শ্বশুরবাড়ির সদরে পৌঁছেছিল। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রায় সোয়া ছ' ফুট লম্বা এক বিশাল চেহারার বৃদ্ধ। তাঁকে চেনে মন্দার। গৌরগোপাল। পিউয়ের কাকা।

"তুমি কে হে! ক্যানভাসার নাকি?"

"আজ্ঞে না। এই সুটকেসটা দিতে এসেছি। নার্ভাস মন্দারের মুখে এই অদ্ভুত অজুহাতটাই এল। কার সুটকেস, কেন দিতে এসেছে এসব কথাও যে উঠবে তা তলিয়ে ভাবার মতো অবস্থা ছিল না।"

"সুটকেস! সুটকেস কীসের?"

"এটা পিউয়ের জিনিস। আমাদের বাড়িতে ছিল।"

গৌরগোপাল যেন প্রথমটায় কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ যেন তাকে চিনতে পেরে তাঁর গলায় বাজ ডেকে উঠল, "ও, তুমিই সেই হারামজাদা! এত সাহস! ওরে হারু, ওরে গদাই, এদিকে আয় তো একবার।"

মন্দার কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে বাড়ির ভিতর থেকে এবং পাড়ার আনাচ-কানাচ থেকে লোকজন প্রায় ছুটে এসে ঘিরে ফেলল তাকে।

এই সেই হারামজাদা কুত্তাটা! এই মন্দার।

সবাই যেন এতকাল তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। এই সুবর্ণ সুযোগটির জন্যই। সেই ক্ষিপ্ত, মারমুখো জনতার ভিতরে দাঁড়িয়ে মন্দার ভয়ে এত সিঁটিয়ে গিয়েছিল যে গলা দিয়ে কোনও স্বরই ফোটেনি। একটা ছেলে তার বুকের কাছে জামাটা এমন খামচে ধরেছিল যে গলা চেপে দমবন্ধ হয়ে আসছিল তার। তারপরই শুরু হল ঘুসির পর ঘুসি। প্রথম ঘুসিটা খেয়েই সে ছিটকে চিৎপাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আর তখনই সেই অবস্থায় হঠাৎ ওপরের বারান্দায়

প্র ব ন্ধ প্র হ স ন স্মৃ তি ক থা

প্রদীপ বসু
[illegible] ₹২৫০
নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ভাবনার ইতিবৃত্ত
রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি ₹২০০
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
[illegible] ₹১০০০
প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা ₹৮০০
চমকে দেওয়া দারোগা-সাহিত্য
[illegible] ₹১৫০
অঞ্জন সেন
[illegible] ছবিতে কথায় ₹২৫০
উন্নয়ন বিতর্ক ₹২৫০
সমাজ-অর্থনীতির দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা
[illegible] ₹১০০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ
তিন দশক ₹৬০০
নগেন্দ্রনাথ বসু
[illegible] ₹২৫০

চর্চাপদ

গ ল্প উ প ন্যা স জা র্না ল ভ্র ম ণ

কমলকুমার মজুমদার
[illegible] ₹৪০০
পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ₹৩৫০
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible] ₹১৫০
রবি সেন
এই রাতে বেশ্যারা অত চেঁচাচ্ছে কেন ₹১৫০
মানিক চক্রবর্তী
[illegible] ₹১৫০
মলয় রায়চৌধুরী
ছোটোলোকের ছোটোবেলা ₹১৫০
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible] ₹২৫০
অভিজিৎ সেনগুপ্ত
সুন্দরবনের ডায়েরি ₹১৬০
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
[illegible] ₹২৫০
নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ ₹৫২৫

আমাদের বই পাবেন: দে, দে'জ, ক্রসওয়ার্ড, বলাকা, বুক ফ্রেন্ড, আন্তিক, চক্রবর্তী অ্যান্ড চাটার্জী এবং www.clickforboi.in

চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন: (০৩৩) ২২৫৭ ৩১৪৪ ই-মেল: charchapada@gmail.com

সে পিউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। কোলে মেয়ে। তারপর আর তাকানোর ফুরসতই পেল না সে। চারদিকে কয়েকশো লোকের চোখের সামনে ওরকম ভয়ঙ্কর মার খেয়ে সে হাউহাউ করে কাঁদছিল। এত অপমান, এত অনাদর, এত লাঞ্ছনার মতো সে কী করেছে? লাথি চড় ঘুসি তো ছিলই, একজন একটা লোহার রড নিয়ে এসেছিল। সত্যেন তাকে আটকাল, আমরা খুনোখুনি চাই না।

এই প্রচণ্ড মারে যখন অচেতন হয়ে পড়েছিল সে, আর অসহায় শৈশবের মতো কেঁদে যাচ্ছিল, আর সমস্ত পৃথিবীর ওপর অভিমানে যখন ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছিল তার বুক, আর খুব শীত করছিল, খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছিল, তখন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল পাড়ার ক্লাবঘরে। সবাই ঘিরে রেখেছে তাকে। প্রচণ্ড চেঁচামেচি। এরা তাকে আরও মারবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। বড় হওয়ার পর কখনও কাঁদেনি মন্দার। সেদিন সে অবোধের মতো অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিল। আর কাকে উদ্দেশ্য করে যেন মনে মনে বারবার বলছিল, আমার জন্মানোর কী দরকার ছিল? কেন জন্মেছিলাম? হায়! কেন জন্মেছিলাম?

কী সব কাগজপত্র তৈরি করে নিয়ে এল কয়েকজন বয়স্ক লোক। তাকে বলল, "ওহে, ভাল চাও তো সই করে দাও, নইলে তোমাদের পুরো পরিবারকে জেলে ভরে দেব।"

ভয় দেখানোর কোনও দরকার ছিল না। ওরা যেখানে যেখানে বলল সেখানেই অতি কষ্টে সই করে দিল সে। তাতে কী লেখা ছিল তা সে আজও জানে না।

তারপর ক্লাবঘর থেকে তাকে বের করে দেওয়ার সময় সত্যেন, অর্থাৎ সত্যগোপাল তার মাজায় লাথিটা মেরেছিল। আরও একবার চৌকাঠের ওপরে ছিটকে পড়ে গেল সে।

পিছন থেকে কে যেন বলে, "ভাগ, শালা শুয়োরের বাচ্চা!"

নেড়ি কুকুরেরও অধম বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল তার। সে যে কত সামান্য, কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর সেটা ওই দিন আরও ভাল করে বুঝতে পারল সে। অতি কষ্টে নিরালম্ব শরীরটাকে টানতে টানতে চলছিল সে। পায়ের চটিজোড়া উধাও, জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই, সর্বাঙ্গে বিষের ব্যথা, কালশিটে, রক্ত পড়ছে কপাল, গাল, নাক, কনুই বেয়ে, সর্বাঙ্গে ধুলোকাদার আস্তরণ। পিছনে গালাগাল।

পিউদের পাড়াটা অতি কষ্টে পেরিয়ে একটা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল। এই প্রায় চলচ্ছক্তিহীন শরীরটা কত দূর নিয়ে যেতে পারবে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। খানিকটা বমি উগরে এল গা গুলিয়ে। তারপর চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল। পথচারিরা তাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে আড়াল করার তো কোনও উপায় নেই তার। বারবার শুধু কান্না এল বুক ভরে। অঝোরে কান্না। পিউ দোতলায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল। দেখল তার ছোট্ট মেয়েটাও। এটা ভেবে আরও চোখের জল ছুটে এল চোখে।

পকেটের টাকাপয়সা উধাও হয়েছে। হাতের সস্তা ঘড়িটাও আর নেই। মোবাইল নিরুদ্দেশ। সেসব নিয়ে কোনও শোক নেই তার। ওই দিন নিজেকে সবচেয়ে বেশি রিক্ত, দীনহীন বলে মনে হল তার।

বাড়ি ফিরতে বড় কষ্ট হয়েছিল সেদিন। আলিগলি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, জিরিয়ে নিয়ে। ভাগ্যিস সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তবু বহু মানুষ তার আহত, রক্তাক্ত, ধুলোমাখা চেহারাটা দেখে কি অবাক হয়নি!

বাড়িতে ফিরতেই মহা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাউকেই কখনও কিছু বলেনি সে। শুধু একটা কথা, "আমি বলতে পারব না, আমি কিছু জানি না।"

শরীরের ব্যথা একদিন সেরে গেল বটে। কিন্তু অনাদরের কথাটা কি ভোলা যায়?

সত্যেনের সেই লাথিটা আজও তার কোমরে বসে আছে।

মামলাটা হল তার পরে। মিউচুয়াল ডিভোর্সের মামলা। সহজেই তার নিষ্পত্তিও হয়ে গেল একদিন।

এ হল প্রতিশোধ নেওয়া আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার যুগ। পাল্টি না নিলে কারও প্রেস্টিজ থাকে না। তাই সব ঘটনা, সব গল্প, সিরিয়াল, সিনেমাই কেবল শোধ তোলার কথা বলে। কিন্তু মন্দারের মধ্যে প্রতিশোধের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তার পরাজয় এতই সম্পূর্ণ এবং প্রত্যুত্তরবিহীন যে, তার নিজের ভিতরে এক মৃত্যুর শীতলতাই বিরাজ করে। কোনও উত্তাপ নেই, রাগ নেই, প্রত্যাশা নেই।

নির্দয় রোদ্দুরে সে অনেকটা হাঁটল। মনে হচ্ছিল, হাঁটলে ভাল লাগবে। কিন্তু ভাল লাগছিল না। মনে হল, তবু হাঁটাই যাক, আর তো কিছু করার নেই। এই যে সম্ভাবনাহীন, আশাহীন একটা জীবন, এ তবু ভাল। খামোখা নানা প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচতে গিয়ে হতাশার হোঁচটগুলি আর খেতে হচ্ছে না তাকে। জীবনের গতি মসৃণভাবে একটা অন্ধকার টানেলের দিকে নিয়ে চলেছে। কোনও উদ্বেগ নেই তার, কোনও ভয় হচ্ছে না।

সিনেমায়-টিনেমায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, ভাগ্যতাড়িত আশাহত যুবক ছেঁড়া জামা পরে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, গালে দাড়ি, মুখ শুকনো। কিন্তু পাশে ঘ্যাঁস করে একখানা দামি মস্ত গাড়ি এসে ব্রেক কষল এবং গাড়ি থেকে একজন স্যুট পরা লোক নেমে এসে তার হাত ধরে বলল, আরে অমুক যে। কোথায় যাচ্ছিস? আয় আমার গাড়িতে উঠে আয়।

তারপরেই দেখা গেল সেই যুবক তার পুরনো বন্ধু, বিশাল কারবারের মালিক। ব্যস যুবকটির ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

এসব অদ্ভুত অস্তিবাচক কল্পনা মন্দারেরও ছিল একসময়ে। এখন আর নেই। কত লটারির টিকিট কিনত একসময়ে। এখন আর কেনে না।

অনেক জায়গায় চাকরির উমেদারি করেছিল মন্দার। কেউ খুব একটা আশা বা ভরসা দেয়নি। কেউ কেউ বলেছে জুলাইতে, কেউ ডিসেম্বরে, কেউ মার্চে একবার খোঁজ নিতে বলেছে। খোঁজ নিয়ে যে লাভ নেই তা জেনে গেছে মন্দার। আজকাল তার মোবাইল সারাদিন বোবা হয়ে থাকে, কেউ কল করে না। শুধু মাঝে মাঝে জঞ্জালের মতো বাণিজ্যিক এসএমএস আসে।

এখনও এল একটা। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আজই রিচার্জ করলে... ইত্যাদি।

ঘাম হচ্ছে আঝোরে। তেষ্টা পাচ্ছে। খিদে পেয়ে আছে অনেকক্ষণ। মন্দার এসব শারীরিক বায়নাক্কাগুলিকে পারতপক্ষে প্রশ্রয় দেয় না। খিদে, তেষ্টা চেপে থাকে দীর্ঘক্ষণ। জিভ শুকিয়ে পাপোশের মতো খড়খড় করে। শরীর ঝিমঝিম করে। পেটে খোঁদল তৈরি হয়ে যায়। ঢেঁকুর ওঠে।

মোড় থেকে বাসে উঠে পড়ল সে। দুপুরের বাস বেশ ফাঁকা। বসবার জায়গাও পেয়ে গেল। বসেই চোখ বুজে ফেলল। এখন তার ঘুম পাবে। এবং ঘুমোলেই সে নানা বিচিত্র স্বপ্ন দেখবে। অবিশ্বাস্য, অবাস্তব সব স্বপ্ন।

কিন্ডার গার্টেনের মেয়ের টিউটরের দরকার হয় না। কিন্তু যাদের অনেক টাকা, তারা শখ করে রাখে। মিলি বাংলা পড়তে পারে না। মন্দারের কাজ হল সপ্তাহে তিনদিন সন্ধেবেলা তাকে বাংলা গল্পের বই থেকে গল্প পড়ে শোনানো। আজ তার মিলিকে পড়ানোর দিন। নামবার সময় সে টের পেল, আর একটা এসএমএস এসেছে।

চার

"এইট্টি ফোর ইজ এ গুড এজ টু লিভ ইফ ইউ হ্যাভ অল দি টিথ ইন প্লেস, সাউন্ড আই সাইট, স্ট্রং হার্ট, গ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সিস্টেম ইন অর্ডার, নো সুগার, নো ডিমেনশিয়া অর অ্যালঝাইমার্স, নো ব্লাড প্রেসার অ্যান্ড নো ট্রাবল ইন ফ্যামিলি। বোঝলা?"

"আপনি এখনও যথেষ্ট ফিট আছেন দাদু। আমাদের অনেকের চেয়ে আপনি অনেক বেশি মোবাইল। কিন্তু আপনার জিনিসপত্র কই? মাত্র এই একটা ব্যাগ?"

"জিনিসপত্র কমাইয়া ফালাইছি হে। মেটেরিয়াল থিংস যত কমাইয়া ফালাইবা ততই ভাল থাকবা। বোঝলা? এই জিনিসগুলিই যত নষ্টের গোড়া।"

"ঠিক আছে, তাহলে চলুন।"

"খাড়াও। চাকরটারে একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাই।"

"ট্যাক্সি লাগবে না দাদু। নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"গাড়ি আনছ নাকি? কার গাড়ি কও তো? তোমার নাকি?"

"এটা বড়দাদুর গাড়ি। আপনার সোনাভাই।"

"সোনাভাই অখনও হাঁটে চলে তো। নাকি থুত্থুরা হইয়া গেছে?"

"না, থুত্থুরে হওয়ার মানুষ নন। আপনার মতোই ফিট।"

"তবে গাড়ি লাগে কীসে?"

"সে আপনি বুঝবেন না। সংসারে থাকলে অনেক জিনিসের দরকার হয়। আপনি সংসারে থাকেন না বলে ওসবের দরকার হয় না।"

"কথাটা মন্দ কও নাই। তা হইলে কও রওনা হইয়া পড়ি।"

"চলুন।"

"আমার একটু লজ্জা করত্যাছে, বোঝলা? এতকাল খবর-বার্তা নাই, আঙকা গিয়া খাড়ামু কোন মুখে কও তো। হগলে ভাবব, নিষ্কর্মা আপদটা আইছে।"

"ওরকম কেউ ভাববে না।"

"বাড়িতে কি মেলা লোক?"

"হ্যাঁ। গত বিশ বছরে সংসারে তো লোক বাড়ারই কথা।"

"বাচ্চা-কাচ্চাগুলি তো আমারে চিনবও না।"

"আজ্ঞে না। তবে ওসব নিয়ে ভাববেন না। আত্মীয়তার সূত্র যখন আছে তখন চিনতে দেরিও হবে না। আপনি দেখছি ধড়াও পড়েছেন। সেদিন যে বললেন, ওসব ফর্মালিটি এখানে করা যাবে না।"

"কইছিলাম। তারপর দ্যাখলাম, মাতৃদায় বইলা কথা। মহাগুরুনিপাত। দ্যাখলাম, এইখানকার লোকজনই ব্যবস্থা কইরা দিল। হবিষ্যিও করতাছি। এভরিবডি ইজ ভেরি কো-অপারেটিভ।"

"চলুন, আর বেলা করা ঠিক হবে না।"

নীচে নেমে এসে গাড়িটা দেখে চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল হরগোপালের। পাকা দাড়ির ভিতরে ভারি একটা শিশু হাসি। খুশিয়াল গলায় বললেন, "জব্বর জিনিসটা তো! মেলা দাম নিছে, না?"

"না, খুব দামি কিছু নয়। তবে ভাল গাড়ি।"

"ঠান্ডা হয়?"

"হয়।"

"সামনে বসবেন, না পিছনে?"

হরগোপালের চোখে ভারি লোভাতুর দৃষ্টি। বললেন, "সামনে বইলে দেখতে সুবিধা।"

"বসুন, সামনেই বসুন।"

"বেশি জোরে চালাইও না বাপু। আমার অভ্যাস নাই।"

"না দাদু, কলকাতার রাস্তায় জোরে চালানোর উপায়ও নেই। লক্ষ গাড়ি, কোটি মানুষ। গাড়ি যে চলে এই ঢের।"

"আমার তো গাড়িগুড়ি লাগে না। হাইট্যাই মাইলের পর মাইল মাইরা দেই।"

"এখনও এত হাঁটেন?"

"হাঁটন হইল আমার প্যাশন। মাইনসে মর্নিং ওয়াক, ইভনিং ওয়াক করে। আমার ওইসব নাই। আমি হাঁটি হাঁটনের নেশায়। কত কী দেখতে দেখতে হাঁটি, কত কিছু কানে আসে। বাইচ্যা যে আছি, এইটা হাঁটতে হাঁটতে খুব টের পাই। এ ভেরি কালারফুল সিটি।"

"কলকাতা কি আপনার ভাল লাগে? দেশের কথা মনে হয় না? আমাদের বাড়ির সিনিয়র সিটিজেনরা তো দেশ ছাড়া অন্য কোনও জায়গাকে জায়গা বলেই মনে করে না।"

"না হে, আমার প্রেজুডিস নাই। আমার ঢাকাও ভাল লাগত, চাঁদপুরও ভাল লাগত, রাজশাহি-বগুড়াও ভাল লাগত। আর কইলকাতাই বা খারাপ কী কও।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"আইচ্ছা, আমার কিন্তু একটু নার্ভাস লাগত্যাছে।"

"কেন দাদু, নার্ভাস কেন?"

"অনেক অচিনা মাইনসের মধ্যে গিয়া পড়ুম তো!"

"অচেনা হলেও অনাত্মীয় তো নয়। আপনারা বাঙালরা তো আত্মীয়তাকে খুব ইম্পর্ট্যান্স দেন।"

"তা দেই।"

"নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই দাদু। সবাই আপনার জন্য ওয়েট করছে।"

"আমার লিগ্যা? কিন্তু আমি তো একজন ডেজার্টার। ট্রেইটরও কইতে পারো। সংসারের কোনও উপকারে লাগি নাই।"

"অপকারও তো করেননি।"

"আমারে বরং আমার হোম-এই রাইখ্যা আসো। আই অ্যাম ফিলিং অ্যাশেমড।"

সত্যেন হেসে বলল, "আপনাকে দেখে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনি একজন শক্ত নার্ভের লোক। এ ম্যান উইথ গাটস।"

"ক্যান কও তো।"

"আপনি একটা প্রিন্সিপাল-এ স্টিক করে থেকেছেন, সেটা কম কথা নয়।"

"আইয়া পড়লাম নাকি হে?"

"জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে না দাদু?"

"হ। একটু একটু চিনা লাগে।"

"লেক গার্ডেন্সে ঢুকছি দাদু, চিনতে পারছেন?"

"একটু একটু।"

"কেমন লাগছে?"

"খারাপ কী?"

"আগের মতো নিরিবিলি নেই কিন্তু।"

"থাকনের কথাও না। পপুলেশন ইজ রাইজিং এভরিহোয়ার।"

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল সত্যেন। হরগোপাল নামলেন। ভারি সংকুচিত, জড়সড়। একটু অপরাধী ভাব। মুখ তুলে তিনতলা বাড়িটা একবার দেখলেন।

"একইরকম আছে। না?"

বিজ্ঞাপন

info@aimraj.com

যেখানেই বাংলার সুর সেখানেই

www.aimraj.com

"পিছনে বাগানের দিকটায় একটু এক্সটেনশন হয়েছিল। অনেকদিন আগে।"

"বাগানটা নাই?"

"আছে। একটু ছোট হয়ে গেছে।"

"কাঁঠাল গাছটা?"

"আছে।"

হরগোপালের মুখে উজ্জ্বল একটা হাসি ফুটল, "আমি লাগাইছিলাম।"

গোষ্ঠগোপাল, বংশীগোপাল এবং তাঁদের ছেলেরা বৈঠকখানায় বসে নিমন্ত্রণের লিস্টি তৈরি করছিলেন। হরগোপালকে দেখে দুই ভাই গোষ্ঠগোপাল আর বংশীগোপাল প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন, "আইছস?"

তারপর ধড়াধারী, বিজবিজে সাদা দাড়িওলা লম্বা ও সুভঙ্গে চেহারার তিন বুড়োর যা জড়ামড়ি হল তা দেখবার মতোই। আউট অফ দি ওয়ার্ল্ড। তিনজনেরই চোখে জল। মোবাইলে ছবিটা তুলে রাখার ইচ্ছে হয়েছিল সত্যেনের। তারপর ভাবল, এই প্রাণবন্ত দৃশ্যটির নিষ্প্রাণ ভিডিও তুলে কী লাভ? হয়তো ক্যারিকেচার বলে মনে হবে। এঁদের চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিও বেঁচে আছেন। আমেরিকায়। পঞ্চাশ বছর আগে সেই যে পগারপার হয়েছিলেন তারপর বার চারেকের বেশি আসেননি। গত পনেরো বছর স্মৃতিভ্রষ্ট, অ্যালঝাইমার্সে আক্রান্ত নন্দগোপাল বেঁচে থেকেও নেই। তবু তাঁকেও গিরিবালার মৃত্যুসংবাদ জানানোর জন্য ফোন করেছিল সত্যেন। নন্দগোপালের স্ত্রী এলিজাবেথ খবরটা শুনে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, "মাই গড। ওয়াজ শি অ্যালাইভ।"

পরশু রাতে প্রায় দশটা নাগাদ সাবধানী একটা ফোন এল।

সত্যেন 'হ্যালো' বলতেই একটা চাপা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "সত্য নাকি হে?"

"হ্যাঁ, আমি সত্যেন।"

"আমি হরগোপাল।"

"আরে হয়দাদু! কী খবর?"

"মোবাইল ফোন বড় জব্বর জিনিস, কী কও?"

"ঠিক কথা দাদু। কিন্তু হঠাৎ মোবাইল ফোনের কথা কেন?"

"এমনেই মনে হইল। আইজ সকালে একটু গঙ্গার ধারে গেলাম। বোঝলা! মাঝে মাঝে যাই। মানুষ দেখি, নৌকা দেখি, স্টিমার দেখি। নদী হইল গিয়া একটা ডাইনামিক ফোর্স। সিভিলাইজেশনে নদীর কন্ট্রিবিউশন ইজ হিউজ।"

"সে তো ঠিকই দাদু। কিন্তু আপনি বোধহয় আর কিছু বলতে চাইছেন!"

"ইউ হ্যাভ শার্প ব্রেন। কিন্তু সব কথারই একটা প্রোলোগ আছে, বোঝলা।"

সত্যেন হেসে ফেলল, বলল, "নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

"আগে আমার ফিলিংটার কথা কইয়া লই। গঙ্গায় আইজ একখান জাহাজ দেখলাম। বিগ শিপ। জাহাজটা জেটি ছাইড়া যাইত্যাছে। খুব মেলানকলিক লাগল, বোঝলা? একখান কালা রঙের জাহাজ একলা একলা গাং বাইয়া চলল সমুদ্রের দিকে। তারপর অকূল পাথারে গিয়া পড়ব। এ স্লো অ্যান্ড লোনলি জার্নি টু এ ফার অ্যাওয়ে ল্যান্ড। ঠিক কিনা!"

"ঠিক কথা দাদু।"

"অ্যান্ড আই আইডেন্টিফায়েড মাইসেলফ উইথ দ্যাট জাহাজ। মনে হইল, আরে, আমিও তো অকূল পাথারে রওনা দিয়া ফালাইছি। ফর এ লং অ্যান্ড লোনলি জার্নি।"

"ওরকমভাবে ভাবছেন কেন দাদু? আপনি তো একজন স্ট্রং মাইন্ডেড লোক।"

"না হে সত্য, তোমার অ্যাসেসমেন্ট ঠিক না। আসলে আই অ্যাম এ কাওয়ার্ড। আই কুড নট ফেস দি ট্রুথস অফ লাইফ। দাড়িয়াবান্ধা খেলছ কখনও?"

"আজ্ঞে না।"

"খুব মজার খেলা। কূট কৌশলে কান্নি মাইরা শত্রুপক্ষের কোর্ট পার হইতে হয়। আমি বরাবর ওই দাড়িয়াবান্ধা খেইল্যা গেছি। জাহাজটারে দেইখ্যা আমার খুব দুঃখ হইল আইজ। থম ধইরা গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বইয়া রইলাম। অ্যান্ড আই টুক এ ডিসিশন। ভাবলাম, পলাইয়া তো অনেক থাকলাম। নাউ লেট মি ফেস দি ফায়ার অ্যান্ড গোর অফ দিস লাইফ।"

"হ্যাটস অফ দাদু। কী ঠিক করলেন বলুন।"

"প্রথমে ঠিক করলাম আই শ্যাল পারচেজ এ মোবাইল ফোন।"

"সে কী? এত ফিলজফিক্যাল ডিসিশনের পর মোবাইল ফোন? এ তো অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স দাদু!"

"আরে না। সবটা আগে শুইন্যা লও। মোবাইল ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কমিউনিকেশন, ঠিক কিনা!"

"সে তো ঠিক।"

"ইটস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিউনিকেটিভ মিডিয়াম ইররেসপেকটিভ অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস। ঠিক কিনা।"

"হ্যাঁ দাদু।"

"আসলে আমার তখনই তোমার লগে কথা কওনের ইচ্ছা হইছিল। ইচ্ছা হইল কই, সত্য, তুমি অখনই আইয়া আমারে একবার বাড়িতে লইয়া চল।"

"এইবার বুঝেছি দাদু। কোনও কোনও কথা তখন-তখনই একজন বিশেষ মানুষকে না বললে তার আর্জটা কমে যায়। পরে আর রিলেভ্যান্স থাকে না।"

"ইউ আর এ ব্রাইট বয়।"

"আপনি কি মোবাইল ফোন কিনেছেন দাদু?"

"নাঃ।"

"কিন্তু আপনি তো একটা মোবাইল ফোন থেকেই কথা বলছেন।"

"হ। এইটা সুধীর খাস্তগীরের মোবাইল। প্রায় সন্ধ্যা নয়টা না বাজতেই খাইয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাইনের কথা কওনের লোকও বিশেষ নাই।"

"আপনাকে আমি একটা মোবাইল ফোন কিনে দেব।"

"ক্যান? কথা তো হইয়াই গেল।"

"না দাদু, আপনি মাঝে মাঝে নিরুপমা ঠাকুমার সঙ্গেও তো কথা-টথা বলতে পারবেন।"

হরগোপাল একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তুমি তো বড় ঠোঁটকাটা হে! যাউক গা, ফ্র্যাংক অ্যান্ড ফ্রি হওয়া খারাপ না। আমাগো এই বয়সে আর লজ্জা পাইয়া কী হইব! আর কথাটা মন্দ কও নাই। তাইনের শরীর ভাল না, হাঁটুর ব্যথায় অচল। কমিউনিটি হল-এ অখনও রোজই আসেন, তবে কতদিন পারবেন কওন যায় না। একখান মোবাইল থাকলে সুবিধাই হয়। তাইনের একখান আছে।"

"এবার বলুন, কবে আসবেন।"

"যামু? তুমি কী কও?"

"আপনাকে নিয়ে আসব বলেই তো শ্মশান থেকে সোজা আপনার হোম-এ গিয়েছিলাম দাদু। আপনার সোনাভাই, ধনভাইরা এ সময়টায় আপনাকে খুব মিস করছেন।"

"কী জানি ক্যান জাহাজটা দেখার পর থিকাই আমারও ক্যান মনে হইত্যাছে একবার হগলের লগে একটু বইয়া থাকি গিয়া। নস্টালজিয়া, বোঝলা!"

"বুঝেছি দাদু।"

"আর একটা কথা কমু? কিছু মনে করবা না?"

"না দাদু।"

"তোমার কি মনে হয় কালার হ্যাজ এনি মেসেজ?"

"তার মানে কী দাদু?"

"এই যে লাল নীল হইলদা সবুজ নানান রং এই প্রতিটা রঙেরই কি কিছু সিগনিফিক্যান্স আছে বইলা তোমার মনে হয়?"

"থাকতেই পারে। শুনেছি লাল হল রাগের রং।"

"হ, লালের কথা আমিও শুনছি। বাট হোয়াট ডাজ ব্ল্যাক

সিগনিফাই?"

"কালো নিয়ে আপনার সমস্যা কীসের?"

"ওই যে সকালে কালা জাহাজটা দেখলাম, ট্ বি ফ্র্যাংক উইথ ইউ আমি কিন্তু একটু ভয় পাইছি।"

"ভয়! ভয়ের কী আছে? বেশির ভাগ জাহাজের রংই তো কালো।"

"ভয়ডরের তো কোনও লজিক থাকে না। মাইয়ালোকরা তেলাচোরা দেইখ্যা ডরায় ক্যান কইতে পারো? আমি কই হ্যাজ ব্ল্যাক এনিথিং ট্ বি আইডেন্টিফায়েড উইথ ডেথ?"

"এই তো আপনি আবার পেসিমিস্টিক হয়ে যাচ্ছেন।"

"আরে না। দিস ইজ এ পাসিং ফেজ। কাইট্যা যাইব। কিন্তু মাঝে মাঝে এইসব চিন্তা এক দিক দিয়া ভাল। মনটা সংসার থিক্যা, স্বার্থচিন্তা থিক্যা আলগা থাকে।"

"দাদু, আপনি কাল সকালেই এই বাড়িতে চলে আসুন। আমি গিয়ে নিয়ে আসব আপনাকে।"

"নাহে সত্য, কাইল না। যদিও আমি ব্যাচেলর তবু, আমারও কিছু কয়কর্তব্য আছে। একটু ব্যাঙ্কেও যাইতে হইব।"

"তাহলে ডে আফটার টুমরো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল।"

"ওঃ, তর তো বড় হুড়াহুড়ি রে ছ্যামরা!"

"আপনার মতো একজন প্র্যাকটিক্যাল লোকের ডিসিশন নিতে এত দেরি হয় কেন বলুন তো!"

"হেইরে তুই বুঝবি না। আফটার এ লং একজাইল হোমকামিং ইজ অলওয়েজ ডিফিক্যাল্ট। ঠিক আছে, পরশুদিনই আয়।"

সেই পরশুদিনটাই আজ।

একটা উপেক্ষিত বিস্মৃত লোককে এই নতুন করে আবিষ্কার করার ভিতরে গভীর আনন্দ আছে। বাতিকগ্রস্ত, খ্যাপাটে লোকটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ভারি আকর্ষক। সত্যেন মাত্র দুটো দিন দেখেই মায়ায় পড়ে গেছে। একটু দূর থেকে সে তিন বুড়ো ভাইয়ের মিলনদৃশ্য দেখছিল। গোষ্ঠগোপাল এমনভাবে হয়দাদুর হাত ধরে আছেন যেন ছাড়বেন না, পাছে ফের পালিয়ে যায়। বংশীগোপাল হরগোপালের কাঁধে হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলছেন। হরগোপাল ভারি খুশি, মুখে অপ্রস্তুত একটু বোকা হাসি, চোখে অপ্রতিভ দৃষ্টি। যেন এত সমাদর প্রত্যাশাই করেননি। মানুষ, যে কোনও মানুষই এক গভীর অধ্যয়নের বিষয়।

গিরিবালার বিছানায় সাদা ধপধপে একখানা চাদর টানটান করে পাতা। তার ওপর গিরিবালার মধ্যবয়সের একখানা রঙিন বাঁধানো ফটোগ্রাফ রাখা। দু'ধারে বালিশ, ফটোতে টাটকা মালা, সামনে ছড়ানো শিউলি ফুল। খাটের পাশে মেঝেতে ধূপকাঠির স্ট্যান্ডে চন্দন ধূপ জ্বলছে। সুগন্ধে ম' ম' করছে চারধার। বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘরটিই ছিল গিরিবালার ঘর। তিনতলায়, দক্ষিণ-পুব খোলা, বেশ বড়সড়, লাগোয়া একটি পরিচ্ছন্ন বাথরুম। দক্ষিণের জানালা দিয়ে নীচের মুঠোভর বাগানখানা দেখা যায়। কদম ফুলের গয়না-পরা হাত জানালায় টোকা দিয়ে যেন বলতে চাইছে, কেমন সেজেছি দেখ!

"কেমন ঘর দাদু?"

"আচিমিৎকার।"

আচিমিৎকার একটা বাঙাল এক্সপ্রেশন। গিরিবালা বলতেন। হরগোপালের মুখে হাসি ধরছে না। মেঝেতে পাতা কম্বলাসনের শয্যায় বাবু হয়ে বসে, দু'হাঁটুতে হাতের ভর রেখে একটু একটু দুলছেন, "মায়ের কাছেই য্যান আছি বইলা মনে হইতাছে, বুঝলি?"

"বুঝলাম। এই ঘরে একা থাকতে ভয় করবে না তো!"

হরগোপাল অবাক হয়ে বলেন, "ভয়! ভয় করবো ক্যান রে? মায়ের গায়ের গন্ধ পাই। ভয়ের কী?"

"সেদিন একটা ভয়ের কথা বলছিলেন তো! সেই যে কালো জাহাজ!"

হরগোপালের রোগা মুখখানা হাসিতে দোফলা হয়ে গেল। বললেন, "হ। খুব ডরাইছিলাম সেদিন। তবে ঠিক ভয়ও না। কেমন য্যান মনটা বড় উদাস হইয়া গেল।"

নতুন কেনা মোবাইলটা বের করে হরগোপালের হাতে দিল সত্যেন। বলল, "কেমন? পছন্দ তো!"

"কীরে এইটা?"

"আপনাকে মোবাইল ফোন কিনে দেব বলেছিলাম যে!"

হরগোপালের মুখে হাসি, বিস্ময়, আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস একসঙ্গে ফুটে উঠল, "দিলি নাকি আমারে? দিলি?"

"দিলাম তো!"

"বাহারে! এইটা তো দেখি জব্বর জিনিস কিনছস! অ্যাঁ! ক্যামেরাও আছে! আরে বাঃ!"

শিশু যেমন নতুন খেলনা পেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শোঁকে, আদর করে ঠিক যেন তেমনই করছিলেন হরগোপাল। বোধহয় গিফট পেয়ে অভ্যাস নেই বহু কাল। উদ্দীপ্ত মুখে বললেন, "প্রথম ফোনটা কারে করুম ক' তো!"

"ঠাকুমাকেই করুন। নিরুপমা ঠাকুমাকে।"

"দুর পাজি!"

"ঠাট্টা করছি না দাদু, তাঁকেই করুন। তিনি হয়তো অপেক্ষা করছেন আপনার খবরের জন্য।"

ভারি লাজুক মুখে হরগোপাল বললেন, "করুম?"

"করুন না। লজ্জার কী আছে? আপনি কথা বলুন, আমি আসছি।"

সত্যেন ঘরের দরজা পেরিয়ে এসে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল, হরগোপাল খুব সাবধানে নম্বরের চাবি টিপছেন।

পাঁচ

"হাই! আমি পার্থ।"

"হাই। আমি ঘুঙুর।"

"ক্যান আই গিভ ইউ এ রাইড?"

ঝিনচাক মোটরবাইকটা দেখতেই পাচ্ছিল ঘুঙুর। লেটেস্ট মডেলের জিনিস। সে বাইক-টাইক তত ভাল চেনে না। তবে জিনিসটা গিজমো, এটা বুঝতে অসুবিধে নেই। লক্কা ছেলেদের বায়না মেটাতে বাপেরা যেসব জিনিস ব্যাঙ্ক লোন নিয়েও কিনে দেয়।

ঘুঙুর মিষ্টি করে হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আজ আমার বয়ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে ডেট আছে। হি উইল বি এনি মোমেন্ট হিয়ার। বাই।"

ছেলেটা তাই বলে গেল না। বলল, "দেন লেট আস টক।"

"অ্যাবাউট ওয়েদার অর সামথিং?"

কথাটার ইঙ্গিত বুঝবার মতো কালচার ছেলেটার নেই। সে বলল, "কফি শপে বসবে? বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করে দাও না, ওখানেই চলে আসবে।"

"না, পার্থ। আই অ্যাম বিজি টুডে।"

ঘুঙুরের মোবাইলটা প্রায় আর্তনাদ করছে। স্ক্রিনে দেখল, দিদা।

"হ্যাঁ বলো।"

বিপদনাশিনীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ছোঁড়াটা কী বলছে তোকে?"

"আর ইউ ওয়াচিং?"

"হ্যাঁ। ছাদ থেকে দেখছি তো।"

"তুমি টেনশন কোরো না। ঘরে যাও। ম্যানেজ করে নেব।"

"না, তুই ফিরে আয়। আমি অন্য ব্যবস্থা দেখছি।"

"উঃ, তোমাদের এত ভয় কীসের? খেয়ে ফেলবে নাকি?"

পার্থ এতক্ষণ মোটরবাইকের ওপর বসে ছিল, এবার নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ চাই। প্লিজ। আমি বাজে ছেলে নই।"

"আমি চাইছি না।"

"কেন ঘুঙুর?"

"আমি একটু চুজি। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি না।"

"প্লিজ। আমি জাস্ট তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে—"

"প্লিজ পার্থ, আমার অত সময় নেই।"

"আমার মোবাইলে তোমার কত ফটো তোলা আছে জানো? দেখবে?"

"আজকাল মোবাইল থাকলেই বাজে ছেলেরা চুরি করে মেয়েদের ফটো তোলে। তাতে কী হল?"

"আমি শুধু তোমার ফটোই তুলেছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর এফোর্টস। আমাকে এবার যেতে হবে। বাই।"

ছেলেটা পিছু পিছু আসছিল, "প্লিজ ঘুঙুর, প্লিজ—আমি জাস্ট তোমার বন্ধু হতেই চাই। তার বেশি কিছু নয়।"

ঠিক এই সময়ে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলেন বিপদনাশিনী। রাস্তায় বেরোবার মতো অবস্থাও নয়। আঁচল বেসামাল হয়ে রাস্তায় লুটোচ্ছে।

"অ্যাই ছেলে। কী চাইছ তুমি। অ্যাঁ। কী চাও?"

"আরে দিদিমা, অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? জাস্ট কথা বলছি।"

"রাস্তায় মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে কেন? এত সাহস কীসের?"

"খারাপ কিছু করেছি কি দিদিমা? অপহরণ তো নয়।"

ঘুঙুর বিপদনাশিনীর হাত দুটো ধরে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলে, "এরকম করছ কেন? রাস্তায় লোক জমে যাবে যে! আমার হাতে ছেড়ে দাও না ব্যাপারটা।"

"না। এত আস্পদ্দা কীসের বল তো। তোকে মোটরবাইকে তুলতে চাইছিল না?"

"চাইছিল, কিন্তু আমি তো উঠিনি।"

বিপদনাশিনীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে খানিকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে ঠান্ডা করে ঘণ্টাখানেক বাদে যখন ঘুঙুর বেরল তখন পার্থ ছিল না।

এটা ছিল গত শনিবারের কথা। আর আজ আর একটা শনিবার।

আজ কৃষ্ণগোপাল স্যারের বাড়িতে খুব কঠিন অঙ্ক নিয়ে ডুবে ছিল ঘুঙুর। অঙ্কে ডুবে গেলে তার জগৎসংসার হারিয়ে যায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন ছুটি পেয়ে বেরল তখনও তার মাথার ভিতরে অঙ্কের রেশ রয়েছে। ভারি আনমনা ছিল। লক্ষই করেনি তার পিছু পিছু একটা মোটরবাইক খুব ধীরগতিতে গুড়গুড় করে আসছে।

স্যারের বাড়ি থেকে দিদার বাড়ি একটু দূর, বেশ অনেকটা রাস্তা। এটুকু সে রোজই হাঁটে। রিকশার ঝাঁকুনির চেয়ে হাঁটা অনেক ভাল। ভয়ডর তার একটু কমই আছে। মোটরবাইকটাকে টের পেয়ে সে একবার পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। বাইকটা চালাচ্ছে পার্থ, কিন্তু আজ তার পিছনে একটা ফরসা মতো ছেলে বসে আছে। হাতে একটা হ্যান্ডিক্যাম আছে বলে মনে হল। বোধহয় তাকে তাক করে ছবি তুলছে।

এই ছবি তোলা ব্যাপারটা ভারি বিরক্তিকর। কিন্তু মোবাইলে যা ছোট্ট হ্যান্ডক্যামে কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে কিছুই করার থাকে না। প্রথম কথা, কে কখন ছবি তুলছে তা বুঝবারও তো উপায় নেই। আজকাল প্রত্যেকের মোবাইলেই ক্যামেরা।

ঘুঙুর হাঁটার গতি বাড়াল না। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। কাপুরুষদের ভয় পাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

যখন দিদিমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন দেখল দিদার বাড়ির কাছেই একটা মোটরবাইক দাঁড় করানো। আর মোটরবাইকের পাশেই অমিতাভ বচ্চনের মতো বেজায় লম্বা এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে জিনস আর সাদা একটা টি-শার্ট। মুখখানা দারুণ গম্ভীর। চোখে যেন বাঘের মতো দৃষ্টি। না, লোকটা ঘুঙুরের দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। তাকিয়ে আছে তার পেছন দিকে কোথাও।

ঘুঙুর টের পেল, পিছনের মোটরবাইকটা স্পিড তুলে সাঁ করে একটা ইউ টার্ন নিয়ে হঠাৎ কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লম্বা ছেলেটার পাশ দিয়েই সে দিদার বাড়িতে ঢুকে গেল।

দরজা খুলেই বিপদনাশিনী বললেন, "এসেছিস। বাঁচলুম। এতক্ষণ যা চিন্তা হচ্ছিল বলার নয়।"

"কেন গো দিদা, চিন্তা করছিলে কেন?"

"করব না? ওই বদ ছোঁড়া যে তোর পিছনে লেগেছে!"

"কলকাতা জুড়েই তো বদ ছোঁড়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দিদা।"

"কিন্তু এ ছোঁড়ার যে দুরন্ত সাহস। আজও আমাকে ফোন করে ভাবসাব করতে চাইছিল।"

"কী বলছিল?"

"সে অনেক তোষামোদের কথা। সব কি মনে করে রেখেছি। রাগে গা জ্বলছিল। শেষে বলল, একদিন আমার মাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমি বললাম, কেন বাছা, আমার সঙ্গে তোমার মায়ের কী দরকার। তখন বলে কি, না, মায়ের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন আমরা কীরকম হাই ফ্যামিলি। আমি বললুম, রক্ষে করো বাপু, তোমার ফ্যামিলি হাই না লো তা জানার দায় পড়েনি আমার। ভাল করিনি?"

"বেশ করেছ। ভয় পেও না, ওরা জেনারেলি কাওয়ার্ড হয়।"

"ওটা কাজের কথা নয়। এখন পাজি ছেলেদের পকেটে আবার বন্দুক পিস্তল, ছোরাছুরি, বোমা পর্যন্ত থাকে। ওদের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে। বেশি সাহস দেখাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ?"

"উঃ, তুমি যা একখানা ভিতু না! এখন একটু কফি খাওয়াবে?"

"কফি খাবি? সে কি, কোনওদিন তো কফি খেতে চাসনি।"

"আজ একটু ইচ্ছে করছে।"

"খিদে নষ্ট হবে না?"

"হলে হবে। দাও তো একটু কফি।"

বিপদনাশিনী কফি করে এনে দেখলেন নাতনি বইখাতা ছড়িয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়াশুনোয় ডুবে আছে।

নিঃশব্দে কফিটা পাশে রেখে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন বিপদনাশিনী। ঘুঙুর ডাকল, "দিদা।"

"বল।"

"বাড়ির সামনে মোটরবাইক নিয়ে একটা খুব লম্বা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল আজ। কে বলো তো!"

"ও মা! সে আমি কী করে বলব?"

"খুব লম্বা, ফরসামতো, জিনস আর সাদা টি-শার্ট পরা।"

"ও থেকে কি চেনা যায়। জিনস আর টি-শার্ট পরে কত লোকই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"এ পাড়ার সবাইকেই তো তুমি চেনো।"

"দুর পাগল। সবাইকে চেনা কি সোজা নাকি? লেক গার্ডেন্স কি একটুখানি এলাকা? কেউ হয়তো আশপাশের বাড়িতে কাজে এসেছিল। কত বাইরের লোক আসছে যাচ্ছে।"

"আজ পার্থ ছেলেটা আর তার এক বন্ধু মোটরবাইকে আমাকে ফলো করছিল। ছবিও তুলছিল বলে মনে হল।"

"ও মা গো! এতক্ষণ বলিসনি তো!"

"বললেই তো তুমি ভয় পাবে।"

"তারপর কী হল?"

"কিছু একটা হল। বাড়ির সামনে যে লম্বা ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল তাকে দেখেই বোধহয় মোটরবাইক ঘুরিয়ে নিয়ে সাঁ করে পালিয়ে গেল।"

"ও মা। তাই?"

"হ্যাঁ দিদা। আমার মনে হল ছেলেটা বোধহয় গুন্ডা-টুন্ডা হবে। তুমি গুন্ডা লাগাওনি তো দিদা?"

বিপদনাশিনী গালে হাত দিয়ে বলেন, "শোনো মেয়ের কথা!"

"তাহলে ছেলেটাকে তুমি চেনো না তো!"

"না দেখে কী করে বলি চিনি কিনা। তবে চেহারার কথা শুনে বাপু চেনা বলে মনে হচ্ছে না।"

বইয়ের মধ্যে ফের ডুব দিয়ে ঘুঙুর বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর কফি।"

"আজ কুচো চিংড়ি দিয়ে একটা ছেঁচড়া রান্না করেছি। কেমন লাগবে তোর কে জানে।

"তুমি যা-ই রাঁধো তাই আমার ভাল লাগে। আমার খাওয়া নিয়ে

তুমি এত টেনশন করো কেন বলো তো।"

"নিজের জন একটু তৃপ্তি করে খেলে বুকটা ঠান্ডা হয়।"

"তোমার রান্না তো ভীষণ ভাল।"

দিদাকে নিয়ে এই এক মুশকিল। সবসময়ে ঘুঙুরকে নিয়ে তার যত ভাবনা। আদরটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওই যে পার্থ ছেলেটা তার সঙ্গে কথা বলেছিল বলে সর্বনাশ হল ভেবে আলুথালু হয়ে রাস্তায় ছুটে গিয়েছিল তাইতে ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল ঘুঙুর। যেন বা চোখের সামনেই সীতাহরণ হয়ে যাচ্ছে।

মুখটা সামান্য তুলে ঘুঙুর দেখতে পেল, বিপদনাশিনী জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিচ্ছেন।

"কী দেখছ দিদা?"

"ওই যে লম্বা ছেলেটার কথা বললি।"

"সে অনেকক্ষণ চলে গেছে। আমি বাড়িতে ঢুকবার পরই মোটরবাইকে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পেয়েছিলাম।"

"এ তো প্রায় সদর রাস্তাই। কত লোক যাতায়াত করছে সারাদিন।"

"হুঁ। আজ একটু তিলের বড়া ভেজো তো। অনেকদিন খাইনি।"

"খাবি? দাঁড়া দেখছি তিল আছে কিনা।"

"না থাকলে দরকার নেই।"

"ও মা! ঘরে না থাকলেই কি, মন্টুর দোকানে ফোন করলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে দিয়ে যাবে।"

"তোমার পি.আর. দারুণ, না দিদা?"

"তা একটু আছে। কতকাল এ পাড়ায় আছি বল তো!"

"তবু লম্বা ছেলেটাকে চিনতে পারলে না?"

"লম্বা ছেলের অভাব কী? চারদিকে কতই তো লম্বাচওড়া ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন রে, ছেলেটা তোকে কিছু বলেছে-টলেছে নাকি? পাজি বদমাশ বলে মনে হল?"

"কিছু বলবে কি, আমার দিকে তাকায়ওনি। শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। "

"তাই বল। আমি ভাবলুম, আবার কোন বদমাশ উদয় হল।"

"মনে হল, কারও জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তবে সেটা আমার জন্য নয়। অন্য কারও জন্য।"

"আচ্ছা, ওকে নিয়ে আর ভাবতে হবে না। পড়াশুনো তাড়াতাড়ি সেরে চানে যা। আমি তিলের বড়ার ব্যবস্থা করছি। যা হোক মেয়ে আজ মুখ ফুটে যে কিছু একটা খেতে চেয়েছে সেই ঢের।"

"দাঁড়াও, আগে কফিটা খাই।"

বিপদনাশিনী চলে গেলেন।

ঘুঙুর হাঁটার গতি বাড়াল না।

ঘুঙুর পড়া ছেড়ে কফির কাপ হাতে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। এখনও জুলাই মাস। কিন্তু বাইরেটা একদম শরৎকালের মতো। নরমসরম রোদ, আকাশে সাদা, ছেঁড়া মেঘ, গরমটাও তেমন নেই। আজ এখন আর পড়ার বইয়ে মন দিতে ইচ্ছে করছে না।

উল্টোদিকে দুটো প্লট ফাঁকা। ওখানে ছেলেরা মাঝে মাঝে বল নিয়ে খেলে। বাদবাকি সময় ফাঁকা পড়ে থাকে। বর্ষায় অনেক আগাছা হয়েছে জায়গাটায়। আর ল্যাম্পপোস্টের কাছে লম্বা ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল। কেন দাঁড়িয়ে ছিল তাই নিয়ে একটা খটকা বিঁধে আছে ঘুঙুরের মনে। ওই ছেলেটাকে দেখেই পার্থ আর তার বন্ধু বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যায়, অন্তত ঘুঙুরের তাই সন্দেহ। ছেলেটার চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলছিল। এটা কি সম্ভব যে ছেলেটা এ বাড়ির সামনে ঘুঙুরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল? এবং সেটা খুবই লজ্জার বিষয় হবে যদি তার দিদাই ওই ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনিয়ে থাকে। তার দিদার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। ছেলেটা হয়তো দিদার চেনা পাড়ার কোনও মাস্তান।

কান দুটো একটু গরম হয়ে গেল ঘুঙুরের। পার্থ হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল, কিন্তু তা বলে গুন্ডা লাগানোর মতো সাঙ্ঘাতিক ঘটনা তো ঘটেনি। এরকম তো হামেশাই হয়।

কফিটা খেয়ে ঘুঙুর ছাদে উঠে এল। খুব ভাল করে চারপাশটা ঘুরে লক্ষ করল। ধারে কাছে, যত দূর দেখা যায়, পার্থর চিহ্নমাত্র নেই। এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র বলে তাকে মনে হয়নি ঘুঙুরের।

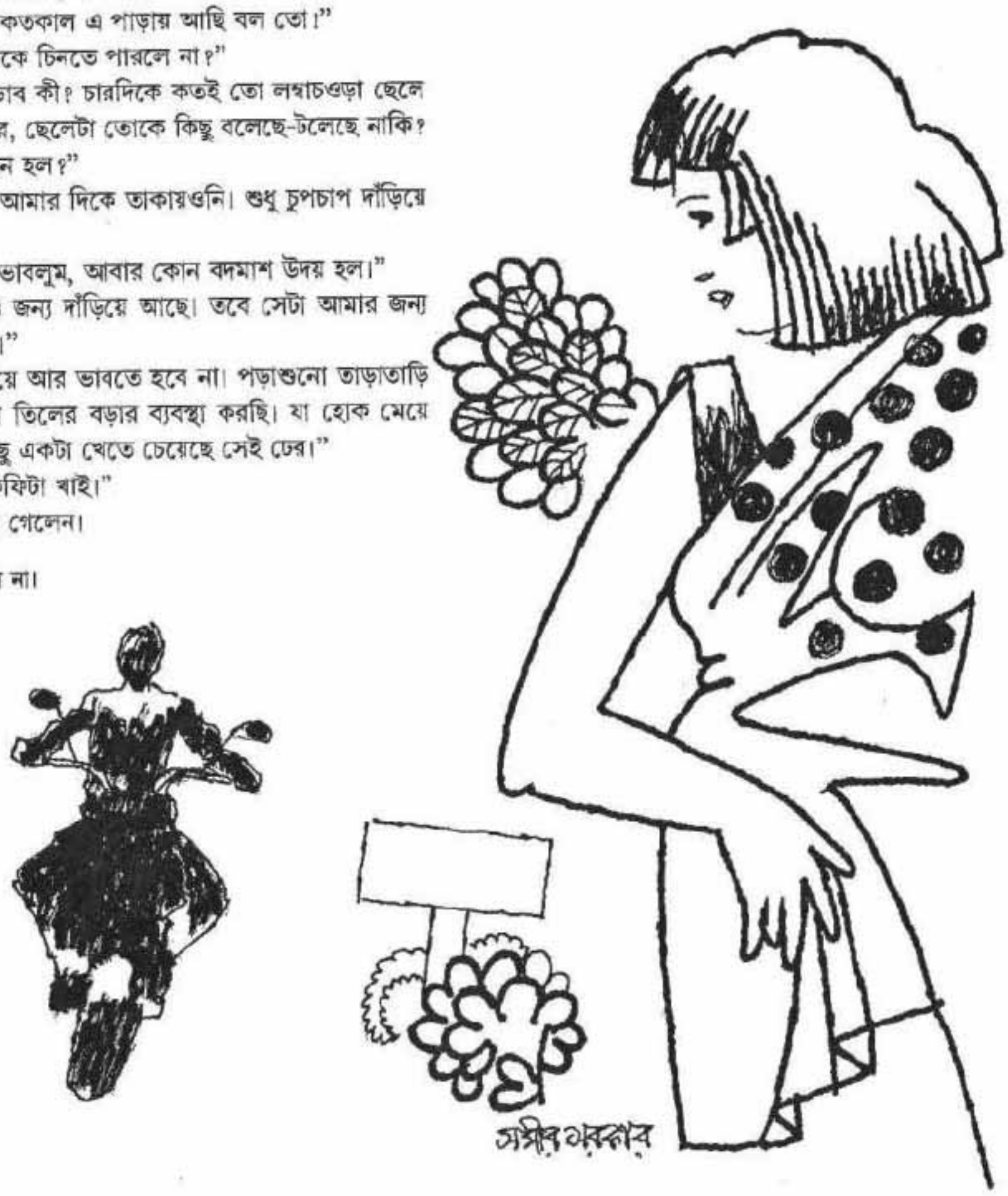

ছাদ থেকে নেমে এসে টিভিটা চালিয়ে একটু চেয়ে রইল ঘুঙুর। একটা গানের প্রোগ্রাম হচ্ছে। কিন্তু সে শুনছিল না। রিমোর্ট টিপে চ্যানেল বদলে বদলে গেল। আসলে আজ তার কোনও ফোকাস নেই। কিছুই তেমন ভাল লাগছে না। একটা অস্থির ভাব টের পাচ্ছে ভিতরে।

একটু বাদেই তিলের বড়ার মিষ্টি গন্ধটা নাকে এল। সেই সঙ্গে দিদার কণ্ঠস্বর, ও ঘুঙুর, চানে যা। বড়া ভাজছি।

ঠান্ডা জলে চান করতে আজ একটু গা শিরশির করল প্রথমে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চান করল। তার জন্য স্পেশাল সাবান আর শ্যাম্পু আর তোয়ালে সাজিয়ে রাখা। এই বাথরুমও শুধুমাত্র ঘুঙুরের জন্য। তার দাদু আর দিদা কেউ এই বাথরুম ভুলেও ব্যবহার করে না। একটু বাড়াবাড়ি ঠিকই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন আর এক্সক্লুসিভ বাথরুমের জন্য সে খুশিই হয়।

যখন খেতে বসল তখনও মনটা আড় হয়ে আছে।

"ভাল করে খাচ্ছিস না কেন? শুধু দাঁতে কাটছিস। ছেঁচড়াটা মুখে দিয়ে দেখ দেখি কোন অখাদ্য রেঁধে রাখলুম।"

"একটা কথা বলবে দিদা?"

"কী কথা?"

"ওই লম্বা ছেলেটা কে?"

"ওই দেখো, কতবার তো বললুম তাকে চোখেই দেখিনি!"

"রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর হেঁটে গেলেও তোমার চোখ এড়ায় না। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তুমি সারা পাড়ার ওপর নজর রাখো। আর অত বড়সড় চেহারার ছেলেটাকে তোমার চোখেই পড়ল না?"

"ওরে, তোর যেন আজ কী হয়েছে। আজ যে আমার হাত জোড়া ছিল। ফ্রিজ পরিষ্কার করলুম, রেশন তুললুম, সব গোছাতে হল। শনিবার কি আমার দম ফেলার ফুরসত থাকে? তা ছেলেটাকে নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? সে তো আর তোর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেনি!"

"আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ছেলেটা হয় গুন্ডা, না হয় সাদা পোশাকের পুলিশ। নিশ্চয়ই কেউ তাকে খবর দিয়ে আনিয়েছে। নইলে ঠিক এই বাড়ির সামনে ওরকম অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিচুড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না।"

"তুই কি ছেলেটাকে দেখে ভয় পেয়েছিস?"

"না, ভয় পাব কেন। তবে যদি ওকে কেউ অ্যাপয়েন্ট করে থাকে তবে সেটা লজ্জার ব্যাপার। আমি তো তোমার মতো অবলা নই যে বাজে ছেলেরা পিছনে লাগলে ভয় পাব।"

"অত বীরত্বের দরকার নেই বাপু। বললাম না, আগেকার দিন আর নেই। আজকাল বদ ছেলেরা কথায় কথায় খুনটুন করে বসে।"

"পার্থর মতো কাওয়ার্ডদের সেই নার্ভ নেই দিদা। তবে এই ছেলেটা হয়তোবা পারে।"

"কী যে বলিস! ও সেরকম ছেলেই নয়।"

"ঘুঙুর হেসে ফেলে বলে, কী করে বুঝলে?"

"কী বুঝলাম?"

"ছেলেটা যে সেরকম ছেলে নয়!"

বিপদনাশিনী ধরা পড়ে গিয়ে নিজেও হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোর বড্ড বুদ্ধি। তোর সঙ্গে কি কথার খেলায় আমি পারি?"

"তাহলে সত্যি কথাটা এবার বলে ফেলো।"

"ও তো আমাদের সতু। লম্বা গোপালের ভাইপো। দেখিসনি ওকে?"

"না তো! অবশ্য স্যারের বাড়ির পুরুষেরা সবাই খুব লম্বা।"

"সতু গুন্ডাও নয়, পুলিশও নয়। তবে ডাকাবুকো ছেলে। অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

"তাহলে তুমিই ওকে খবর দিয়ে আনিয়েছ?"

"কী করব বল, ওই পার্থ পোড়ারমুখো যে প্রায়ই আমাকে ফোন করে জ্বালিয়ে মারছে। কেবল তোর মোবাইল নম্বর চায়।"

"কিন্তু উনি কী মনে করলেন বলো তো! ভাবলেন তো যে, আমি একজন আনস্মার্ট, দুর্বল, ভিতু মেয়ে।"

"ওরে না। সতু ওসব ভাববার লোক নয়।"

"ওঁর মনের কথা তুমি জানলে কী করে?"

"তা আর জানি না!"

"মোটেই জানো না। আর আজকালকার মেয়েদেরও তুমি চেনো না। একালের মেয়েরা সব সিচুয়েশনই হ্যান্ডেল করতে পারে। তোমাদের মতো আমরা পুরুষনির্ভর নই। বুঝলে। উইমেন্স লিবের কথাও বলব, আবার বিপদে পড়লেই প্রোটেকশনের জন্য পুরুষকে ডাকব তা হয় না।"

"তোর দুর্জয় সাহস বাপু।"

"এতে সাহসের কী আছে বলো তো! তোমার হায়ার করা গুন্ডা তো আর আমাকে সব সময়ে, সব জায়গায় প্রোটেকশন দিতে পারবে না। আর এই কলকাতা শহরেই কয়েক হাজার পার্থ বা ওর চেয়েও অনেক বদমাশ ছেলে অপেক্ষা করে আছে। তা বলে তো ঘরে বসে থাকতে পারে না কেউ।"

"সে তো ঠিক কথা। তা বলে সপ্তাহে এই একটা দিনই তো তুই আমার কাছে আসিস। যদি ওই বদমাশটার জ্বালায় তোর আসাই বন্ধ করতে হয়, তাই সতুকে বলেছিলুম একটু দেখতে।"

"ভীষণ লজ্জায় ফেলেছ আমাকে। কেউ প্রোটেকশন দিচ্ছে ভাবলেই আমার ভারি রাগও হয়। সিচুয়েশনটা কন্ট্রোলের বাইরেও ছিল না।"

"এখন মাথা ঠান্ডা করে খা তো। মাথা গরম থাকলে রান্নায় স্বাদসোয়াদ পাবি না। কত কষ্ট করে মাথা খাটিয়ে রাঁধলুম।"

"কিন্তু ঘুঙুরের মাথা ঠান্ডা হচ্ছিল না। খুব রাগ হচ্ছিল দিদার ওপর। দিদা মানুষ ভীষণ ভাল, কিন্তু বড্ড বোকা। আর ভিতু। আর ভিতু বলেই সারা জীবন একজন পুরুষের দাসীবাঁদীর মতো হয়ে মাথা নুইয়ে নিজেকে এত ক্ষয় করে ফেলল। ঘুঙুর তার দাদুকেও ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু এটাও জানে তার দাদু খুব একটা ভাল মানুষ নয়। কানাঘুষোয় সে শুনেছে দাদুর একজন বান্ধবী আছেন। আছেন মানে এখনও আছেন, এই বয়সেও। আর তার বোকা আর ভালমানুষ দিদা জীবনে কখনও তার জন্য রাগারাগি করেনি, ঝগড়াও করতে যায়নি। যদিও দিদা দাদুর সেই বান্ধবীর কথা ভালই জানে।"

ঘুঙুর বিপদনাশিনীর ছেঁচড়াটা দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। এই মহিলার হাতে কী ম্যাজিক আছে কে জানে। যা রাঁধে তাই যেন জিভকে হিপনোটাইজ করে ফেলে।

"হ্যাঁ দিদা, শুধু রেঁধেবেড়ে, রেশন তুলে, বাজার করে, বাসন মেজে আর ঘর মুছেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে ভাল লাগে বুঝি?"

বিপদনাশিনী একটু হাসলেন, তারপর হাসিটা গিলে ফেলে বললেন, "আর কী করতে পারতাম বল তো। ভগবান এক-এক জনকে এক-এক রকম করে গড়ে পাঠান। সকলকে দিয়ে কি সব কাজ হয়? আমি তো বাপু নিজের মতো করে বেশ আছি বল, সারাদিন খেটেপিটে বেশ তো সময় কেটে যায়।"

"তা বলে রেশনটাও কেন তোমাকেই তুলতে হবে? বাসনই বা কেন তুমি মাজবে? ঘর মোছাটাই বা কোন শিল্পকাজ বলো!"

"ওরে পাগল, ওসবও তো একজনকে করতে হবে।"

"হ্যাঁ। তার জন্য একটা লোক রাখতে তোমার আপত্তি কী?"

"আপত্তি আর কী। লোক রাখাই যায়। কিন্তু এই যে সংসারের সব কাজ নিজে হাতে করি, এতে কী হয় জানিস? সংসারটার সঙ্গে আমার একটা ভালবাসা হয়। আলগা থাকলে এই বাড়ির আনাচকানাচ, কোনাখুপচি, প্রত্যেকটা জিনিস আর গোটা বাড়িটার সঙ্গে কি আমার ভাব হত? ওরা যেন আমার সঙ্গে কথা কয়। ওই যে ঘুলঘুলিতে চড়াই পাখির বাসা, ওই পাখিগুলো পর্যন্ত আমার ভাবের মানুষ। যখন বয়স হবে, আর হাঁটুর জোর, বুকের দম থাকবে না, তখন কাজের লোকের হাতে সংসার ছেড়ে দেব। তার আগে নয়।"

"তোমার সঙ্গে আমি আর পারি না। শুধু সংসার চিনেছ।"

"হ্যাঁ রে, আমি কাজ করলে তোর প্রেস্টিজে লাগে না তো!"

www.allbdbooks.com

ঘুঙুর হেসে ফেলল।

"হাসলি যে!"

"প্রেস্টিজে লাগবে কেন? যেদিন কাজের লোক আসে না সেদিন তো আমিও ঘর ঝাড়ামোছা করি, বাসন মাজি। মা আর বাবা তো সবসময় তোমার একজাম্পল দেয়। কিন্তু তোমার তো বয়স হচ্ছে।"

"বসে থাকলে বয়স আরও তাড়াতাড়ি হবে।"

"আমি দেখেছি তুমি বইপত্র বা খবরের কাগজ পড়ো না, টিভি দেখো না, সিনেমা-থিয়েটারে যাও না, গান শোনো না। এরকম কেন বলো তো! তোমার কি সংসারের কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে মন দেওয়া বারণ?"

বিপদনাশিনী হাসিমুখে বললেন, "তা যা বলেছিস। আমি একটা কিম্ভূতই বটে। কেন যে অন্য দিকে মন গেল না সেটাই ভেবে পাই না। তোর দাদু বিয়ে করে এনে সংসারের সঙ্গে জুতে দিল, আর আমিও লেগে রইলুম।"

"দোষটা কি দাদুর?"

"না। তার দোষ হবে কেন? সে তো আর ঝি-চাকর রাখতে বা সিনেমায় যেতে বারণ করেনি। আমারই যেন কেন ওসব ইচ্ছে কোনওদিনই হল না। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু টিভি দেখি, তবে দেখতে দেখতে আবার এ-কাজটা সে-কাজটা সেরে আসি। মন দিতে পারি না।"

"মাত্র দু'জনের সংসারে তোমার এত কী কাজ?"

"সেই তো ভাবি। দু'জনের সংসার বটে, কিন্তু আমার কাছে তো তা নয়। আমার সংসারের মধ্যে যেন অনেক মানুষ ঢুকে বসে আছে। ওই যে ছাদে বা বারান্দায় রোদ এসে পড়ে, ওই যে জানালা দিয়ে হাওয়া বাতাস বা বৃষ্টির ছাঁট আসে, ওই যে আলমারি, বাক্সপ্যাঁটরা, ফ্রিজ, বাসনপত্র, ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকি, কোনটাকে বাদ দিয়ে আমার সংসার বল তো। কেন যে সবাইকেই আমার জন বলে মনে হয় কে বলবে। আমার কটা চামচ, কটা কাপপ্লেট, কটা হাতাখুন্তি আছে সব বলে দিতে পারি। এমনকী এ বাড়িতে কটা ইঁদুর, কটা আরশোলা বা টিকটিকি আছে তাও আমার হিসেবে আছে। তাই ভাবি সংসার নিয়ে যে এত মজে রইলুম, এর জন্য পরকালে আমার সদগতি হবে না।"

"দিলে তো মনটা খারাপ করে?"

"কেন রে, মন খারাপের আবার কী হল?"

"ওরকম করে বললে আমার মন খারাপ হয় না? তোমাকে ওরকম অসুরের মতো খাটতে দেখলে আমার মায়া হয় না, বলো!"

"হবেই তো! মায়া না হয়ে পারে? যার মায়া নেই তার কি বেঁচে থাকার আনন্দ আছে? আজ তোর খাওয়ার রকমটা ভাল দেখছি না। কেবল খুঁটছিস। অন্য দিনের মতো চেটেপুটে খাচ্ছিস না। আজ রান্না ভাল হয়নি নিশ্চয়ই।"

"খুব ভাল হয়েছে। তবে আমি আজ একটু ডিস্টার্বড আছি। আর তার জন্য দায়ী হচ্ছ তুমি।"

"জানি। তুই সতুর কথা ভুলতে পারছিস না।"

"কী করে ভুলব! প্রেস্টিজের ব্যাপার না?"

"যে দেবতার যে পুজো। ফাজিল ফক্কর একটা ছেলেকে যদি জব্দ করার জন্য কিছু করতে হয় তা না করাই তো খারাপ। আর সতু তো কিছু করেনি। শুধু এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তাইতেই দেখ পার্থর ফোনও বন্ধ হয়েছে। পাড়াতেও তার টিকি দেখা যাচ্ছে না।"

ঘুঙুর হেসে বলল, "তাও বলবে তোমার সতু গুন্ডা নয়?"

"কক্ষনও নয়। সতুর মতো ভাল ছেলে পাড়া ঘুরেও পাবি না। মদ-গাঁজা খায় না, বিড়ি-সিগারেটের দোষ নেই, মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না, ওরকম ছেলে ক'টা পাবি?"

"মেয়েদের দিকে না তাকানোটা বুঝি চরিত্রবানের লক্ষণ? ওটা তো কাওয়ার্ডের স্বভাব। আর না তাকানোটা কিন্তু মেয়েদের অপমান করাও। মেয়েরা যে এত যত্ন করে সাজেগোজে, ডায়েটিং করে, বিউটি পার্লারে গিয়ে নানা রকম প্যাক নেয়, সেসব কি পুরুষের না তাকানোর জন্য?"

বিপদনাশিনী ফিক করে হেসে বললেন, "আচ্ছা বাপু, আচ্ছা, সতুকে বলে দেব, যেন এবার থেকে তোর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকায়।"

"অ্যাই দিদা, খবরদার না!"

বিপদনাশিনী খুব হাসলেন। তারপর বললেন, "আজ তো ওদের বাড়িতে ঘাটকাজ ছিল। কাল গিরিবালার শ্রাদ্ধ। সেই জন্য সকালে একবার গিয়েছিলাম। সতুর সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলাম, "দেখ বাবা, আমার নাতনিটা সপ্তাহে মাত্র একটা দিন আমার কাছে এসে কিছুক্ষণ থাকে। আমি সারা সপ্তাহ এ দিনটার পথ চেয়ে থাকি। তা সেটাও বুঝি আমার কপালে সইল না।"

"তখন সব হাপরহাটি বললে বুঝি? ইস, উনি কি ভাবলেন বলো তো! এমন রাগ হয় না তোমার ওপর।"

"তা রাগ করিস আর যাই করিস, আপনজনদের জন্য সব কিছু করা যায়।"

দুপুরে ঘুম হয় না ঘুঙুরের। খাওয়ার পর পড়তেও ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফিরে গিয়েও লাভ নেই। ফাঁকা ফ্ল্যাটে বড্ড একা একা লাগে। তার চেয়ে দুপুরটা সে দিদার সঙ্গে গল্প করেই ভাল কাটায়। কিন্তু আজ তার মুড নেই। তাই বলল, দিদা, আজ বরং আমি দুপুরে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করি।

"ও মা! ঘুমোবি তার অত কথা কীসের? পাখাটা আস্তে করে চালিয়ে ঘুমিয়ে থাক।"

ঘুঙুর ভেবেছিল, "ঘুম আসবে না। কিন্তু কে জানে কেন, আজ শুতে না শুতেই চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেল। হিজিবিজি স্বপ্নও দেখল অনেক। যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে।"

"ইস দিদা, আমাকে ডেকে দাওনি! ইস, দেখো তো, কী ভীষণ দেরি করে ফেললাম।"

"কীসের দেরি রে? কত মাথার কাজ করিস, একটু-আধটু মাথার বিশ্রামও তো দরকার। ঘুম না হলে কি মাথার বিশ্রাম হয়?"

বিরক্ত হয়ে ঘুঙুর বলে, "সারা রাত তো মোষের মতো ঘুমোই। তাতে কি মাথার অনেক বিশ্রাম হয় না!"

"আচ্ছা বাবা, একদিন তো মোটে। তোর জন্য মোমো করে রেখেছি। দুটো খেয়ে যা। আজ দুপুরে মোটেই পেট ভরে খাসনি।"

ঘুঙুর গজগজ করল বটে, কিন্তু মাংসের পুরভরা মোমোও খেল। বলল, "তোমার পাল্লায় পড়ে আমি একদিন ধুমসি মোটা হয়ে যাব, দেখো।"

বিপদনাশিনীর কোনও কালে ড্রেসিংটেবিল বা বড় আয়না ছিল না। দরকারও হয়নি। মাঝে মাঝে সিঁথি ঠিক করার জন্য একটা ছোট হাত-আয়না ব্যবহার করতেন। কিন্তু মেয়ে বড় হওয়ার পর ড্রেসিংটেবিল কিনতে হয়েছিল। মোমো খেয়ে উঠে ড্রেস করার পর আজ হঠাৎ আয়নায় নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ঘুঙুর।

"দিদা।"

"কি রে?"

"এই আদ্যিকালের আয়নায় আর কতকাল চলবে বলো তো!"

"ও মা! ওটাও তো কোনও কাজে লাগে না। নিজের ছিরি দেখতে ইচ্ছে যায় না বলে লেস-এর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখি।"

"আচ্ছা আমি কি একটু ওভারওয়েট বলে তোমার মনে হয়?"

"তুই ওভারওয়েট? কোথায় যাব মা! তোর তো চিমসে ধাত।"

"তোমাকে বলেছে। কোমরের কাছটায় বেশ একটু ফ্যাট জমে আছে বলে মনে হচ্ছে। সাইজ জিরো হওয়ার কথা।"

"আমাকে এখনও চালসেতে ধরেনি। তোর একটুও ফ্যাট নেই।"

"এবার একটা থ্রি পিস আয়না কেনো তো। থ্রি পিস ছাড়া ভাল বোঝা যায় না।

"তাই হবে বাপু। তোর দাদু এলে বলবখন। নাতনির বায়না হয়েছে শুনলে সোমবারই এনে ফেলবে।

www.allbdbooks.com

আজ মনটা ভাল নেই ঘুঙুরের। কিংবা ঠিক ভাল নেই যে, তাও নয়। আজ মনটা কিছু চঞ্চল, অস্থির। একটা কিছু হচ্ছে শরীরের মধ্যে। অন্য দিন এমন হয় না।

দিদার বাড়ি থেকে লর্ডসের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটা বড্ড ঘিঞ্জি। এত গাড়ি চলে যে হাঁটাই মুশকিল। তবে এই এলাকায় নানা রকম গলিঘুঁজি থাকায় ভিড়টা এড়ানো যায়। নিরিবিলি গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে। পথ ভুল হল। এমনটা সাধারণত হয় না। হওয়ার কথাই নয়। কোন খেয়ালে ডান দিকে মোড় ঘুরে সে অন্য দিকটায় চলে এল। একেবারে কৃষ্ণগোপাল স্যারের বাড়ির সামনে এসে ভুলটা ভাঙল তার। ছি ছি, এ কোথায় এসে পড়েছে সে! স্যারের বাড়িতে মিস্তিরি লেগেছে, ম্যারাপ বাঁধছে ডেকোরেটরের লোক, ইলেকট্রিশিয়ান তারের লাইন লাগাতে ব্যস্ত। সবাই বোধহয় লক্ষ করছে তাকে। কী লজ্জা!

কেন এত লজ্জা করল ঘুঙুরের? লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে মোড়ের মাথায় রিকশা ধরল সে। আজ আর রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না।

আজ তার কী হল? কেন এমন হচ্ছে? কেন বারবার এক দীর্ঘকায় পুরুষের দুটো তীক্ষ্ণ শিকারির মতো চোখ তিরের মতো ভেদ করে যাচ্ছে তাকে? রোজ তো কত পুরুষকেই চোখে পড়ে তার। এমন হয় না তো!

রেবেকার জন্মদিনের ছোট্ট পার্টি ছিল আজ। সন্তোষপুরে। ঘুঙুর যখন পৌঁছল তখন বন্ধুরা তার আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে।

রেবেকা এসে হাত ধরে বলল, "এত দেরি করলি যে। এমা! একটুও সেজে আসিসনি কেন? ম্যাড়ম্যাড়ে দেখাচ্ছে যে!

নিজের ওপর ভারি রাগ হল ঘুঙুরের। সাজবে বলে বাড়িতে গিয়েওছিল সে। তারপর কী করে যেন আনমনে বিনা সাজেই চলে এসেছে। কোনও মানে হয়?

ছয়

সে আর আগের মতো নেই। সে কি আর আগের মতো নেই?

এই দুটো প্রশ্নই মাঝে মাঝে তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দেয়। তখন একজন আর একজনকে দেখে, বিচার করে, দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, নিজের জন্য করুণা হয়।

এখন এই অপরাহ্নে তাদের ছোট্ট মিষ্টি বাগানটায় আলো আর ছায়ার মায়াবী চিত্রময়তার মধ্যে সে তার চঞ্চল মেয়েটার পিছনে ছুটছে। তার হাতে একখানা বাটি, তাতে একটু ছানা। মৌ কিছু খেতে চায় না। আর সারাদিন তাকে খাওয়ানোর জন্য নিরলস, ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করে যায় পিউ। এই একটা ব্যাপারে তার ধৈর্য অপরিসীম। মাঝে মাঝে চড়টা-চাপড়টা যে দেয় না তা নয়, কিন্তু বড্ড কষ্ট হয়। বাঁচবার তো কথাই ছিল না ওর। কত কষ্ট করে প্রাণশিখাটুকু ঝড়-বাতাস থেকে আড়াল করে রেখেছিল বলে, নইলে কবেই—

মৌ তো আর আগের মতো নেই। ছ' বছর বয়সে সে একটু দিঘল হয়েছে। গায়ে মাংস লাগেনি তেমন, তা বলে খুব রোগাও নয়। ডাক্তার বলেছে, কোনও সমস্যা নেই, সব ঠিক আছে। কিন্তু পিউ জানে, সব ঠিক নেই। বেড়ে উঠতে গেলে বাচ্চাদের বোধহয় একজন বাবারও দরকার হয়, শুধু মাকে দিয়ে সব সমস্যা মেটে না। আগে সমস্যা ছিল না, কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে এবং প্রায়ই মৌ প্রশ্ন তোলে, আচ্ছা, আমার বাবা কোথায়?

আগে পিউ বলত, "নেই।

"নেই? তাহলে কোথায় গেল?

"জানি না।

মায়ের মেজাজ দেখে মৌ আর প্রশ্ন করতে ভয় পেত। কিন্তু প্রশ্নটা ওর ভিতরে তো বসে থাকত ঘাপটি মেরে। সেই নীরব প্রশ্নটাকে তো আর গলা টিপে মেরে ফেলা যাবে না। স্কুলে না গেলে হয়তো বাবা সম্পর্কে ওর কোনও প্রশ্ন তৈরিই হত না। কিন্তু বন্ধুদের কাছে বাবার কথা শুনে শুনে বাবা নামক একজন রূপকথার রাজার মতো ধারণা হয়েছে ওর।

অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তার পর থেকে মৌ তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে পিউ আর 'নেই' কথাটা উচ্চারণ করে না। বলে, "তোমার বাবা একটু দূরে থাকেন। একদিন ঠিক আসবেন। সেই ঘটনাটাই অনেকটা মুচড়ে এবং দুমড়ে দিয়েছিল পিউকে।

মন্দার তার সুটকেসটা ফেরত দিতে এসেছিল। ঠিক বুঝতে পারেনি, এ বাড়িতে তার বিরুদ্ধে কতটা বিদ্বেষ আর ঘেন্না বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করে আছে। মৌকে নিয়ে ঘরে একটু শুয়ে ছিল পিউ। নীচে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে অবাক হয়ে উঠে গিয়েছিল বারান্দায়। নীচে মন্দার বিবর্ণ মুখে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তাকে ঘিরে দশ-বারোজন লোক। মন্দার ভিতু, নরম প্রকৃতির, মুখচোরা এবং লাজুক। কখনও কোনও উগ্রতা দেখেনি পিউ ওর মধ্যে। শুধু যেদিন ওর মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল পিউ, আর ওর মায়ের হাতটা ভেঙে যায়, সেদিন রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে একটা চড় মেরেছিল মন্দার। সেই একটা চড়ই তাদের সম্পর্কের মধ্যে সমুদ্র রচনা করে দিয়েছিল। অথৈ জলের ব্যবধান।

অত মার কি খেতে পারে মানুষ! কী নিষ্ঠুরভাবে একটা মানুষকে ওরকম মারা যায় তা এর আগে কখনও দেখেনি পিউ। চড় ঘুসি কিল লাথির বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

আর হতচকিত, স্তম্ভিত, অসহায় প্রতিরোধহীন একজন পুরুষ বাচ্চা ছেলের মতো হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। টালুমালু করে চারদিকে চাইছে, ঘুসি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে! উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফের কার লাথি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কোনও মারই ঠেকানোর চেষ্টা করছে না। ঠোঁট ফেঁটে রক্ত গড়াচ্ছিল, মাথা থেকে রক্তের ধারা নামছিল গাল বেয়ে, সর্বাঙ্গে রাস্তার মলিন ধুলো, চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে কী দশাই করেছিল ওরা! সব ভুলবে পিউ, কিন্তু ওই কান্নাটা নয়। যেন মায়ের ওপর অভিমানে একটা অবোধ বাচ্চা কেঁদে জানাচ্ছে সে কত দুর্বল, কত অসহায়।

সর্বাঙ্গ শীতল, হাত-পা শক্ত, দম বন্ধ করা অবস্থায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অপলক চোখে দেখেছিল সে। গলা দিয়ে একটা প্রতিবাদের শব্দও বেরয়নি স্বর বুজে গিয়েছিল বলে। তার স্খলিত হাতের বাঁধন থেকে মৌ সেদিন হয়তো পড়েই যেত। কিন্তু ভাগ্যিস মৌও দৃশ্যটা খানিকক্ষণ নীরবে দেখে তার কচি হাত দিয়ে মায়ের মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে পাখির মতো গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "ওরা ওকে মারছে কেন মা?

মৌকে জড়িয়ে ধরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে ঘরে চলে এসেছিল পিউ। বলেছিল, "জানি না।

এরপর মৌ অনেকক্ষণ কথাই বলেনি, বড্ড চুপ করে গিয়েছিল। এমনকী একটু পরে যখন পিউ ওকে দুধ খাইয়েছিল তখন একটুও না কেঁদে বিনা প্রতিবাদে দুধ খেয়ে নিল। অবশ্য কয়েক মিনিট বাদেই পুরো দুধটা বমি করে দেয়। আর কোনও প্রশ্ন করেনি মৌ। কিন্তু অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারেনি। কখনও বলেছে 'গরম লাগছে', কখনও বলেছে 'পেটে ব্যথা'। কিন্তু কাঁদেনি। বড্ড চুপ ছিল। তবু ও তো জানতও না যে মার-খাওয়া লোকটা ওর বাবা।

ক্লাবঘরে নিয়ে গিয়ে ওরা ডিভোর্সের কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়েছিল, মুচলেকা আদায় করেছিল, সবই শুনেছে পিউ। এত কিছুর দরকারই তো ছিল না। মন্দার দুর্বল প্রতিপক্ষ। সহজেই ওসব হয়ে যেতে পারত। পিউ ওসব নিয়ে মোটেই ভাবেনি কখনও।

গিরিবালা একদিন তাকে বলে, "শুনলাম জামাইরে নাকি অরা চ্যাঙ্গাব্যাঙ্গা কইরা মারছে! জামাইরে কেউ মারে?

"তা আমি কী করব বলো!

"তুই গিয়া বুক দিয়া আটকাইতে পারলি না?"

পিউ মুখ নিচু করে বলল, "বাড়ির সবাইর যা ওর ওপর রাগ। আমি কি ঠেকাতে পারতাম?"

"রাগ ক্যান? পোলাটা কি খারাপ?"

www.allbdbooks.com

"তা ওদেরই কেন জিজ্ঞেস করো না। আমি কী বলব?"

"জন্মে শুনি নাই কেউ জামাইরে ধইরা মারে।"

"খুব মেরেছে গিরিমা। বাচ্চাদের মতো হাউহাউ করে কাঁদছিল।"

"আহারে! কার বুকের ধন কোনখানে গিয়া গইড় খায়।"

আর সব ভুলে যাবে পিউ, শুধু মন্দারের ওই কান্নাটা ভুলবে না। যতবার মনে পড়বে ততবার তার চোখে জল আসবে, বুক ভার হবে। ইচ্ছে হবে দৌড়ে গিয়ে মা যেমন শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে ধুলো আর অপমান ঝেড়ে দেয় ঠিক তেমনটি করতে। কিন্তু আর কি হয়? পিউ তো আর পিউ নেই।

মন্দারকে একবার ফোন করার ইচ্ছে হত পিউয়ের। লজ্জায় পারেনি। তবে শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় শুকতারাকে একদিন ফোনে ধরেছিল সে।

"শুকতারা, ও বাড়ির খবর কি?"

"খবর তো খারাপ কিছু নয়। তবে মন্দারদার খবর জানো তো!"

"না। কী খবর?"

"মন্দারদার তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। গড়িয়াহাটার কাছে মোটরগাড়ির ধাক্কা লেগে কী অবস্থা।"

"তারপর?"

"পাড়ার সবাই হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিছুতেই যায়নি। হ্যাঁ পিউ, তোমাদের কি কাটাকাটি হয়ে গেল?"

"কী জানি!"

"আমরাও তো জানতুম এ বিয়ে টিকবে না। তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে। মন্দারদাদের সঙ্গে কি তোমাদের সম্পর্ক হয়? তবু তো তুমি মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলে।"

পরিষ্কার পুলিশ কেস। মন্দারকে মারধর করার পর পুলিশ আসবে ভয়ে সত্যেন এবং পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা আগেভাগেই গিয়ে থানায় মন্দারের নামে একটা এফআইআর করে রাখে। তাতে বলা ছিল যে, মন্দার জোর করে পিউকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন গুন্ডা নিয়ে এসে বাড়িতে হামলা করেছিল।

কিন্তু মন্দার কোনও পুলিশ কেস করেনি। সেটা তার মহত্ত্ব হয়তো নয়, করেনি ভয়ে।

বাড়ির লোকের কাছে তার ভাবমূর্তি বিশেষ ভাল নয়, জানে পিউ। তার জন্যই তার বাবা এখন স্থায়ী হৃদরোগী। মায়ের প্রেশারের রোগের সূত্রপাত। ফিরে আসার পর সেই আগের সম্পর্কটা আর ছিল না। এখনও নেই। বাবার চোখের মণি ছিল সে। মায়ের ভীষণ ভাল বান্ধবী। এখন সারাদিনে দু'পক্ষের খুবই কম কথা হয়। দায়সারা গোছের। যেন পড়শি। এমনকী তার মেয়েটাও এ বাড়ির তেমন আদর পেয়ে উঠল না। দাদু বা দিদিমার সঙ্গে তার ভাবও হল না তেমন। শুধু মাকে আঁকড়ে থাকলে হওয়ার কথাও নয়। মেয়েকে বড্ড বেশি আগলে রেখেছিল বলে কেউ বেশি ভাবও করতে পারেনি মৌয়ের সঙ্গে।

বাগানের আলোয় ছায়ায় মেয়ের পিছন পিছন দৌড়ঝাঁপ করতে করতে হঠাৎ থমকে গেল পিউ। ভিতরের বারান্দায় বিষাণ দাঁড়িয়ে আছে।

বিষাণকে দেখলে একটু লজ্জা পায় সে। তার কাকিমার ভাইপো। ভীষণ রকমের বামপন্থী এবং অর্থনীতির অধ্যাপক। মাস কয়েক আগে বিনা ভূমিকায় একদিন সন্ধেবেলা তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যায় বিষাণ। বলেছিল, "একটু কথা আছে।"

পিউ কিছু আন্দাজও করেনি। বিষাণদাকে সে ছেলেবেলা থেকে চেনে। এ বাড়িতে দীর্ঘদিনের যাতায়াত।

ছাদে নিয়ে গিয়ে কোনও ভণিতা না করেই চাঁছাছোলা গলায় বলে বসল, "আমাকে বিয়ে করবে পিউ?"

আচমকা গুলি চালিয়ে দেওয়ার মতোই প্রস্তাব।

সেটা গুলির মতোই বেজেছিল পিউয়ের। সে ককিয়ে উঠে বলেছিল, "সে কী?"

"আমি একজন অনেস্ট ম্যান। তেমন রোমান্টিক মানুষ নই। কিন্তু দায়িত্ব নিলে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি। প্রস্তাবটা দিয়ে রাখলাম, তুমি ভেবে দেখো। যদি আমাকে গ্রহণযোগ্য মনে হয় একবার ফোনে জানিয়ে দিও।"

"বিষাণদা, আমার বিয়ে হয়েছিল, আমি একটা মেয়ের মা।"

"তাতে কী? পৃথিবীর কোনও সম্পর্কই তো পার্মানেন্ট নয়। কম্বিনেশন পাল্টে যেতেই পারে। আর একটা কথা।"

"কী সেটা?"

"তোমার কাছে প্রস্তাবটা করার আগে আমি তোমার বাবা আর মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁদের কনসেন্ট আছে।"

"কিন্তু—"

"আমি জানি, প্রস্তাবটা একটু আকস্মিক। কিন্তু আমি তো রোমান্টিক নায়কদের মতো মন-ভোলানো ডায়ালগ জানি না। যা মনে হয় তা সোজাসাপটা বলে দিই। কোনও জবরদস্তি নেই পিউ। ভাল করে প্রস্তাবটার সব দিক ভেবে দেখো।"

বিষাণ চ্যাটার্জি একজন অত্যন্ত শক্ত ধাতের পুরুষ। ভাবাবেগ নেই, ঈশ্বর নেই, টেনশন নেই। একসময়ে ব্যায়াম করত বলে অত্যন্ত বলবান চেহারা। ধুতি, পাঞ্জাবি এবং কোলাপুরি চপ্পল ছাড়া কিছু পরে না। চোখে ভারি ফ্রেমের চশমা, ঘন ভ্রু, চৌকো মুখ, দাড়িগোঁফ কামানো। হ্যান্ডসাম বলা যাবে না হয়তো। কিন্তু পুরুষালি আকর্ষণ আছে প্রচণ্ড।

প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবনা শুরু করার আগেই তার মা রাতে গম্ভীর মুখে তার ঘরে এসে বলল, "বিষাণ তোকে কিছু বলেছে?"

পিউ মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে একটা বই পড়ছিল শুয়ে। বলল, "কী বলবার কথা বলছ?"

"ও তোকে বিয়ে করতে চায়।"

"কেন?"

"ও আবার কী কথা! কেনটা কি কোনও প্রশ্ন হল? তোকে পছন্দ করে তাই বিয়ের প্রস্তাব করেছে।"

"আমাকে কবে পছন্দ করল তাই তো জানি না। হঠাৎ ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে বিয়ে করবে! এভাবে বিয়ের প্রস্তাব করে নাকি কেউ? তার একটা ভূমিকা থাকবে তো।"

"ভূমিকা-টুমিকা বুঝি না বাপু, বিষাণ তো আর ন্যাকা পুরুষ নয়। প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। তোর বাবার এবং আমার দু'জনেরই প্রস্তাবটা খুব পছন্দ।"

"আমাকে ভাবতে দাও মা। আজই তো সবে কথাটা উঠেছে। শকটা আগে সামলে নিই।"

"শক্ বলে মনে হচ্ছে কেন?"

"তোমাদের কি আমাকে বিদেয় করার জন্য খুব তাড়া আছে?"

"তাই কি মনে হচ্ছে? ভালর জন্যই তো বলা। বিষাণ বিদ্বান মানুষ। জামাই বলে পরিচয় দেওয়া যায়।"

"জানি মা। এখন আমাকে দয়া করে একটু ভাবতে দাও।"

কিন্তু ভেবে যে খুব সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল, এমন নয়। আসলে মন্দারের সঙ্গে সম্পর্ক চটকে যাওয়ার পর পুরুষ সম্পর্কেই একটু বিমুখ হয়েছে পিউ। বিষাণ যে একটি উজ্জ্বল যুবক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও উজ্জ্বলতাই আর তেমন আকর্ষণ করছে না পিউকে।

তবে হ্যাঁ, মৌয়ের একজন বাবার দরকার। মা শত ভালবাসলেও একজন শিশুর দুটো দিক পূরণ হয় না। খামতি থেকে যায়। বড় হয়ে হয়তো মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু বাবাহীনতার জন্য মায়ের ওপর একটু হলেও অভিমান থাকবে। নিজের বাবাকে দিয়েই তো পিউ জানে। শৈশবে কৈশোরে তার জীবনের সিংহভাগ জুড়ে ছিল তার বাবা। বাবা কখনও পুতুল, কখনও ছেলে, কখনও প্রেমিক, কখনও ঈশ্বর।

বিষাণ আর একদিন তাকে আমন্ত্রণ করে নিজের গাড়িতে নিয়ে গেল একটা খুব দামি রেস্টুরেন্টে। সেদিন পিউ একটু সেজেওছিল। এমন নয় যে, বিষাণকে ভোলানোর জন্য দরকার ছিল সাজটার। আসলে সেজেছিল যাতে বিষাণ না ভাবে যে তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না

www.allbdbooks.com

পিউ।

"তুমি ইচ্ছে করলে ড্রিংকস নিতে পারি।

"না বিষাণদা, ওটার দরকার নেই। আপনি ইচ্ছে করলে খান।

"আমারও অভ্যাস নেই। পার্টি-টার্টিতে কখনও খাই। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা হওয়া দরকার।

"বলুন।

"তোমার মেয়েকে নিয়ে।

পিউয়ের বুক একটু কেঁপে উঠল। বলল, "মেয়েকে নিয়ে?

"হ্যাঁ। আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, জানোই তো! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তোমার মেয়ে সেটা কীভাবে নেবে তা কি ভেবে দেখেছ?

"না।

"হয়তো খুব অবাক হবে। মায়ের সঙ্গে কোনও পুরুষের ঘনিষ্ঠতা ও তো কখনও দেখেনি। কাজেই ভালভাবে ব্যাপারটা নাও নিতে পারে। বাচ্চাদের একটা জেলাসির ব্যাপার তো থাকেই। মায়ের ভাগ সে কাউকে দিতে চায় না।

"হুঁ। সেটা অসম্ভব নয়।

"তুমি হয়তো চাইবে যে মৌ আমাকে বাবা বলে মেনে নিক, বাবা বলেই জানুক এবং বাবা বলেই মানুক।

"তাতে অসুবিধে কী?

"অসুবিধে এই যে, সেটা ট্রুথ নয়। একটা মিথ্যেকে মিথ তৈরি করাটা অন্যায়। বরং এই শিশুকালেই ওর কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে, আমি ওর বাবা নই। ভুল ধারণা নিয়ে বড় হলে ও পরে কষ্ট পাবে। আর আমিও মিথ্যে ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারি না। তুমি কী বলো?

"আমি উল্টোটা ভেবেছিলাম।

"সেটা কীরকম?

"মৌ আজকাল স্কুলে যায়। সেখানে বন্ধুদের কাছে তাদের বাবার কথা শোনে। তাই আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে ওর বাবা নেই কেন।

"তুমি ওকে সত্যি কথাটা বলে দাওনি কেন?

"ডিভোর্স ব্যাপারটা তো ও বুঝবে না। বাচ্চাদের মন তো আমরা ঠিকঠাক চিনি না, সত্যি কথাটা বললেও হয়তো মনে মনে নানা রকম ধারণা করে বসবে।

বিষাণ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, "আমি তোমাকে এটুকু কথা দিতে পারি যে, তোমার মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের বিন্দুমাত্র ত্রুটি আমি রাখব না। যত্নে যাতে মানুষ হয় তাও দেখব। কিন্তু মিথ্যে একটা পরিচয়ে ও আমাকে চিনুক এটা আমি চাই না।

"তাহলে আপনাকে ও কী বলে ডাকবে?

"আঙ্কল। কিংবা স্যার। ভাল হয় যদি তুমি মাথা খাটিয়ে একটা অল্টারনেটিভ বের করতে পারো।

"আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, জন্মদাতাই শুধু বাবা তা কিন্তু নয়। পালনকর্তাকেও পিতাই বলা হয়ে থাকে।

"ওসব তো শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। সাধুদের বাবা ডাকা হয়, ধর্মগুরুদের বাবা ডাকা হয়। কিন্তু আমি ঠিক সেরকম চাই না পিউ। আমার মরালিটিতে লাগে।

"বুঝেছি। কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে দিন।

"আর একটা কথা।

"বলুন।

"মন্দারকে তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলে। আমাকে হয়তো তুমি ঠিক ভালবেসে বিয়ে করবে না। তাই না?

"ও কথা বলছেন কেন?

"তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সে কথাই বলে। আমাদের বিয়েটা হবে অনেক নিরুত্তাপ, উচ্ছাস এবং আবেগবিহীন। এবং ক্যালকুলেটিভ। সেক্ষেত্রে দু'জনকেই হয়তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। আবেগ জিনিসটা হল একটা ওভারফ্লো। তাতে কেউ কাউকে ঠিকমতো অ্যাসেস করতে পারে না। পরে মিস ক্যালকুলেশনের ফল ভোগ করে।

"ইমোশনাল একসেস-এর কথা বলছেন? প্রেম তো তাই।

"একজ্যাক্টলি। একসেস-এর ফল আউট তো আছেই পিউ।

"হ্যাঁ। সেটা আমি জানি। আমি আর একসেসকে বিশ্বাসও করি না। কিন্তু ভালবাসা জিনিসটা শুধু ক্যালকুলেশন আর অ্যাডজাস্টমেন্টই তো নয়।

"হ্যাঁ। সেটা গ্র্যাজুয়েলি গ্রো করে। থাক, আজ আমরা বড্ড গদ্যে কথা বলছি।

"আমারও একটা কথা জানার আছে। বলব?

"বলো পিউ। আমি তো শোনার জন্যই বসে আছি।

"আমার প্রথম প্রশ্ন আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন?

বিষাণ যেন একটু বিব্রত বোধ করল। কিছুক্ষণ কী ভেবে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, "সে একটা মজার ব্যাপার।

"মজার ব্যাপার! আশ্চর্য।

"মজা মানে অন্য ভাবে নিও না। ব্যাপারটা হয়েছিল প্রায় সাত-আট বছর আগে। তখন তুমি বোধহয় সদ্য ফ্রক ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ ধরেছ, এবং শাড়িও। এ হল সেই তোমার বয়ঃসন্ধিকালের কথা। আর সেটা ছিল শরৎকাল। মনে আছে পিসি আর পিসেমশাইয়ের জন্য আমার বাবা পুজোর ধুতি শাড়িটাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সেটা দিতে গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। সেই সময়ে হঠাৎ বাগানের দিকে তাকিয়ে তোমাকে দেখতে পাই। একটা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে তুমি দোলনায় বসে আছ। পাশে এক বান্ধবী। সেদিনটার কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না। খুব গ্রেসফুল, এথেরিয়াল লেগেছিল তোমাকে। আর তখনই ঠিক করে রেখেছিলাম, সময় হলে আই উইল প্রোপোজ টু ইউ।

"কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি খুব এক্সপ্রেসিভ নই, ভোকাল নই, আর চট করে ঝোঁকের বশে কাজ করি না বলে তোমাকে প্রোপোজ করতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। আজ মনে হয় মানুষের বোধহয় বুদ্ধি বিবেচনা বেশি পাকবার আগেই এইসব সিদ্ধান্ত ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলা উচিত। যদি তা করতাম তাহলে তোমার জীবনে মন্দারের ঘটনাটা ঘটতে পারত না।

পিউ কথাটার সরাসরি জবাব দিল না। কিন্তু তার মন অন্য কথা বলল, বাঃ রে পুরুষ, তুমি আমাকে পছন্দ করে ফেললেই বুঝি সব সমস্যা মিটে গেল? আমি তো কই ওই বয়সের তোমাকে মনেই করতে পারছি না! এতদিন ধরে দেখছি, কখনও তো তোমার প্রতি আমার কোনও দুর্বলতা দেখা দেয়নি! তুমি কি ভাবো যে, তোমার প্রপোজের ওপরেই আমার জীবনের সুখ দুঃখ ঝুলেছিল?

পিউ মৃদু স্বরে বলল, "আপনারও তাহলে ইমোশন ছিল?

"আমি পাথর নই পিউ। আবেগটা একটু কম, এই যা।

"আমার আরও প্রশ্ন আছে।

"বলো পিউ।

"আপনাকে নিয়ে আমি কখনও কিছু ভাবিনি। কোনও ইমোশনও ছিল না আপনাকে নিয়ে। আপনি সত্যি কথা শুনতে ভালবাসেন বলেই এত স্পষ্ট করে বলতে পারলাম। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করা আমার পক্ষে সহজ হবে না। সময় লাগবে। সেই সময়টা কি আপনি আমাকে দিতে পারবেন?

"সেটা কি বিয়ের পর, না আগে?

"বিয়ে হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু আপনি আমার কাছে হয়তো টোটাল সাবমিশন পাবেন না।

"ও গড! টোটাল সাবমিশন! আর ইউ গোয়িং টু বি মাই স্লেভ? কী বলছ পিউ? আমি আবার বলছি, আমার প্রত্যাশা খুব বেশি নয়। তবে এই চৌত্রিশ বছর বয়স অবধি আমি যে বিয়ে করে উঠতে পারিনি, তা তোমার জন্যই।

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"আর কোনও প্রশ্ন?"

www.allbooks.com

"একদিনেই সব প্রশ্ন করে ফেললে কথা ফুরিয়ে যাবে।"

"তা ঠিক। আর আমরা যেন দুই অধ্যাপকের মতো থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করছি। একে তো নিশ্চয়ই প্রেমালাপ বলা যায় না?"

"না। আমরা বড্ড গদ্যে কথা বলছি। লিরিক ইজ মিসিং।"

দেখা আরও কয়েকবার হয়েছে। বেশ কয়েকবার। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা যে তাতে বেড়েছে এমন নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা পিউ আজ অবধি আপনি ছেড়ে তুমিতে নামতে পারেনি। বিষাণও কখনও বলেনি, "আপনি আজ্ঞে ছেড়ে এবার তুমিতে নামলে হয় না?"

দু'জনের সম্পর্কের এই স্থিতাবস্থা দেখে বোধহয় পিউয়ের মা কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। একবার স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন, "তোরা দু'টিতে মিলে কয়েকদিনের জন্য পুরী বা দিঘায় ঘুরে আয় না কেন?"

পিউ অবাক হয়ে বলে, "তা কেন?"

"তাহলে দু'জনের বোঝাপড়াটা ভাল হত। বিষাণ তো প্রায়ই লেকচার ট্যুরে ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, চণ্ডীগড়, দিল্লি যায়। এক-আধবার তুইও তো সঙ্গে যেতে পারিস।"

"তার মানে কী? তুমি আমাকে সস্তা হয়ে যেতে বলছ মা? ওর সঙ্গে ট্যুরে যাওয়ার মানে তো তোমার অজানা নয়।"

"দু'জনেই তো অ্যাডাল্ট। আর কাগজে সইসাবুদটা সেরে নিলেই যদি হয় তাহলে তাই করে নে না। দেরি কীসের?"

"আমার মন এখনও তৈরি হয়নি। আর তুমি যে প্রস্তাবটা দিলে তা এ বাড়ির বড়রা জানতে পারলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র হবে।"

"হোক। আমি কারও পরোয়া করি না। যখন আমার মেয়ের সর্বনাশ হল তখন ওরা কোথায় ছিল?"

"সর্বনাশ কীসের মা? আমার কোনও সর্বনাশ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।"

"সর্বনাশের বাকিটা কী ছিল বল তো।"

"মোটেই কোনও অবৈধ কাজ তো আমরা করিনি। মন্দার আর আমি আইন মেনে বিয়ে করেছিলাম। বৈধ বিয়ে। লিভ টুগেদার নয়, যেটা তুমি মা হয়ে এখন আমাকে করতে বলছ। তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে, যে-মেয়ে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল এবং ডিভোর্স করে ফিরে এসেছে তার কোনও পবিত্রতা থাকতে পারে না। সে এখন যেমন খুশি ভ্রষ্টাচারও করতে পারে, যদি তা দিয়ে একটা শাঁসালো জামাই পাকড়ানো যায়।"

"কী কথার কী মানে দাঁড়াল! বলছিলাম বিষাণকে তো আমরা অ্যাকসেপ্ট করেই নিয়েছি। বিষাণ রেজিস্ট্রি করতেও রাজি। তুই কেবল ঝুলিয়ে রাখছিস।"

"আমার আজকাল কী মনে হয় জানো? তোমরা আমাকে গৌরীদান করে দিলেই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হত। এত সব জটিলতা দেখা দিত না।"

"একটা কথা বলবি? বিষাণকে তোর পছন্দ হচ্ছে না কেন?"

"অপছন্দ তো নয়।"

"তাহলে?"

"ও তুমি বুঝবে না। বিষাণ খুব বাস্তববাদী মানুষ। আমি ততটা নই। ওই মানুষটার সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে আমার কিছু প্রস্তুতি দরকার।"

"আর কত সময় নিবি? বয়স বাড়ছে না?"

"বাড়তে দাও। বয়সের ভয়ে ফের তাড়াহুড়ো করে আর একটা গর্তে গিয়ে পড়তে হবে নাকি?"

আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন?

www.allbdbooks.com

বিষাণের সঙ্গে খুব বেশি যে দেখা হয় তা নয়। সে কাজের মানুষ। প্রায়ই বিভিন্ন সেমিনার, লেকচার ট্যুর বা কনফারেন্সে নানা জায়গায় চলে যায়। আজ প্রায় মাসখানেক পরে দেখা।

ডান হাতের পিঠ দিয়ে কপালের চূর্ণ চুল সরিয়ে পিউ হেসে বলল, "কবে এলেন?"

"গত সোমবার।"

পিউ কোনও বিরহ অনুভব করেনি। খুব একটা মনেও পড়েনি এই বলবান হবু স্বামীটির কথা। সে কি কাঠ হয়ে যাচ্ছে! একটা অজুহাত অবশ্য আছে। বিষাণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না। সে মোবাইল-বিরোধী মানুষ। এমনকী খুব প্রয়োজন না থাকলে সে কদাচিৎ ফোনটোন করে। একবার বলেছিল, আমি কারণে-অকারণে ফোন করতে পছন্দ করি না। সেটা একরকম স্বস্তিদায়কই মনে হয়েছে পিউয়ের কাছে। কারণ বিষাণকে তার বলার মতো তেমন কোনও কথা নেই।

"আপনি ঘরে বসুন, আমি আসছি।"

বিষাণ একদৃষ্টে মৌয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, "তোমার মেয়ের মুখখানা বোধহয় ওর বাবার মতো। না?"

পিউ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? ওর বাবাকে তো দেখেননি।"

"ওর মুখখানা তোমার মতো নয় বলেই অনুমান করলাম। আচ্ছা, আমি বসছি। তোমার যদি আজ সময় হয় তাহলে একটু বেরতে পারি। যাবে?"

পিউ ঘাড় নেড়ে বলল, "যাব।"

বিষাণের গাড়িখানা বেশ। বেশি বড় নয়, খুব কোজি। বসলে একটা ভারি আরাম হয়।

"কোথায় যাবেন? আবার কোনও রেস্টুরেন্টে?"

"না। চলো, এমনি একটু ঘুরে বেড়াই।"

"তাহলে গাড়িতে কেন? হাঁটলেই তো ভাল হত।"

"কলকাতায় নিরিবিলিতে হাঁটবারই কি জায়গা আছে?"

"বন্ধ গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে তো ভাল।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু ভাবছিলাম, আজ কিছু কথা বলব তোমাকে।"

"বলুন না।"

"বলব। আগে একটু ফাঁকা রাস্তা পাই, তারপর।"

ফাঁকা রাস্তা পেতে পেতে সেই রাজারহাট অবধি যেতে হল তাদের। তারপর একটা শূন্য প্লটে গাড়িটা ঢুকিয়ে দাঁড় করাল বিষাণ। একটু হেসে বলল, "আমি তোমাকে না জিজ্ঞেস করে, বিনা অনুমতিতে একটা অপরাধ করে ফেলেছি। সেইজন্য আগেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"ওমা! অপরাধ কবুল হল না, ক্ষমা করার মতো অপরাধ কিনা তাও জানা হল না, ক্ষমা চাইছেন কেন?"

"অপরাধ কিনা সেটা অবশ্য জানি না। তবু হয়তো কাজটা করা আমার উচিত হয়নি।"

"বলে ফেললেই তো হয়।"

"তোমার অনুমতি না নিয়েই আমি একদিন মন্দারের সঙ্গে দেখা করেছি। বেশ কিছুদিন আগে।"

শুনেই কান দুটো ঝাঁঝাঁ করে গরম হয়ে উঠল পিউয়ের। হাত দুটো কোলের ওপর মুঠো পাকিয়ে শক্ত হয়ে গেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল সে। শেষ বিকেলের আলোয় তার পরিবর্তনটা স্পষ্টই দেখতে পেল বিষাণ। সে অনুত্তেজিত গলায় বলল, "কেন দেখা করতে গিয়েছিলাম সেটা তোমাকে বলতে চাই।"

পিউ নীরস গলায় বলল, "আমি তো আপনার কাছে কোনও কৈফিয়ত চাইনি। তবে ব্যাপারটা আমার পক্ষে ইনসাল্টিং।"

বিষাণ চট করে কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুব শান্ত গলাতেই বলল, "অনেকদিন আগে, যখন আমি স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, তখন বয়ঃসন্ধির দোষে আমি একটি মেয়েকে একটা প্রেমপত্র লিখেছিলাম। তার নাম ছিল গৌরী। চিঠিটা পেয়ে সে তার দাদার হাতে সেটা তুলে দেয়। একদিন যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি তখন পাড়ার রাস্তায় গৌরীর দাদা আর তার বন্ধুবান্ধব আমাকে ঘিরে ধরে প্রচণ্ড পেটায়। রাস্তায় ফেলে কিল, চড়, লাথি আর সেই সঙ্গে রড আর লাঠিও খেতে হয়েছিল আমাকে। গৌরী এবং পাড়ার জমায়েত লোকজনের সামনেই। মারে আর অপমানে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে ছাড়া পেয়ে আমি দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করি।

"কোথায় যে গিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। অপমানে অভিমানে কান্নায়, পাগলামিতে আর আত্মগ্লানিতে থাক হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই অপমান আর নির্যাতন আমার জীবনে মস্ত এক বুস্টারের কাজ করেছে। অপমান ঝেড়ে ফেলে যেদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম সেদিন আমি অন্য মানুষ। ব্যায়ামাগারে ভর্তি হই, লেখাপড়ায় প্রবল মনোযোগ দিই এবং আবেগ-টাবেগকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলি। কিছু বুঝলে পিউ?"

"কী বুঝবার কথা বলছেন?"

"দু'-আড়াই বছর আগে মন্দার তোমাদের বাড়িতে একটা সুটকেস পৌঁছে দিতে এসেছিল। তখন বাড়ির আর পাড়ার লোকেরা তাকে খুব নির্দয়ভাবে পেটায়। আমার পিসিমা তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখেছে।"

পিউ নিজের করতলের দিকে নতমস্তকে চেয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "সেটা খুব অন্যায় হয়েছিল। আমার বাড়ির লোককে সেইজন্য আমি ক্ষমাও করতে পারিনি কখনও।"

পিসিমা কয়েকদিন বাদে মন্দারকে ফোন করেছিল তার খোঁজ নিতে। মন্দার কথায় কথায় তাকে বলে, "সুটকেসের অছিলায় সে একবার তার শিশু মেয়েটিকে দেখতে চেয়েছিল।"

"সেটা কাকিমা আমাকেও বলেছে।"

"আমার মনে হয়েছিল আমার এই নির্যাতিত কমরেডের সঙ্গে দেখা করে তাকে তোমাদের পক্ষ থেকে একবার সরি বলে আসা দরকার। বিশেষ করে যে-মেয়েকে দেখতে গিয়ে সে অত মার খেয়ে এল, সেই মেয়েটি একদিন আমাকেই বাবা ডাকবে, এটা ভেবে আমার একটু গ্লানিবোধ হয়েছিল।"

পিউ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। চোখের অবাধ্য জল মুছতে হল রুমালে। তারপর বলল, "আপনি কি এই ঘটনার জন্য কোনওভাবে আমাকে দায়ী ভাবছেন?"

"না পিউ। আমি শুধু ওই হাটুরে মার-খাওয়া মন্দারের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়ে সহমর্মিতা বোধ করেছি। আর কিছু নয়।"

"আমার মেয়েকে নিয়ে কি আপনার কোনও সমস্যা হচ্ছে?"

"হচ্ছে না বললে মিথ্যে কথা বলা হবে।"

"আপনি আমাকে কী করতে বলেন?"

"শুধু একটা অনুরোধ করি, আমাকে বাবা ডাকতে শিখিও না। এ জন্মে ও মন্দারের মেয়ে হয়েই থাক।"

পিউ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার আর ভাল লাগছে না। প্লিজ ফিরে চলুন।"

বিনাবাক্যে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিল বিষাণ। কথাবার্তা হচ্ছিল না। লেক গার্ডেন্সে ঢোকার পর হঠাৎ বিষাণ বলল, "আমার সঙ্গে মন্দারের তফাতটা কোথায় জানো? মার খাওয়ার পর আমার একটা রেসারেকশন হয়েছিল। মন্দারের লড়াই শেষ হয়ে গেছে।"

আজ সন্ধের পর পরিষ্কার আকাশে মস্ত এক রূপকথার চাঁদ উঠল। ছাদে আজ এক পুকুর জ্যোৎস্না। চুপ করে সেই জ্যোৎস্নায় পা ডুবিয়ে ছাদে উঠে এল পিউ।

ছাদের মাঝ মধ্যিখানে একখানা টুল পেতে কে যেন বসা। তার নেড়া মাথায় চাঁদের আলো চকচক করছে।

"কেডা রে?"

গলা শুনে পিউ চিনল। হয়দাদু।

"কী করছ হয়দাদু?"

"কী আর করি। বইয়া আছি। তর মাইয়াটা কই?"

"ঘুমোচ্ছে দাদু। তুমি একলা বসে আছ যে।"

"দোকলা পামু কই রে। আমার আছেটা কে।"

"এই যে আমরা সবাই আছি। আমরা কেউ নই?"

হরগোপাল খুব হাসলেন, "হ, তরা তো আছসই।"

"তাহলে?"

"আছে তো হগলেই, কিন্তু লাগুড় পাই না, বুঝলি?"

"জ্যোৎস্নায় ছাদে একা বসে আছ, আজ কি তোমার একটু বিরহ হচ্ছে দাদু?"

হরগোপাল খুব হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "বিরহের আর বাকি কী রে? বড় বিরহ তো আইয়া পড়ল।"

"ফের ওসব কথা দাদু?"

"ভাবি, খুব ভাবি, বুঝলি?"

"কী ভাবো?"

"হেইরে কইতে পারি না। নানান কথা আইয়া পড়ে মাথায়। নানান উল্টাপাল্টা চিন্তা। মাঝেমইধ্যে মনে হয়, মাথাটাই বুঝি গেছে।"

"তুমি এ বাড়িতেই কেন থেকে যাও না হয়দাদু?"

"থাকলে থাকতে পারি। অনেককাল সংসারের বাইরে তো। মেলা অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগব।"

"নিরুপমা ঠাকুমাকে ছেড়ে থাকতে পারো না, না?"

হরগোপাল হাসলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "তর বিরহ নাই রে পিউ? ছামরাটার কথা তর মনে হয় না?"

পিউ একটু চুপ করে থেকে বলে, "হয়। আজ হচ্ছে।"

"আমার একটা কথা কী মনে হয় জানস?"

"কী দাদু?"

"মাইয়ালোক হইল বৃক্ষ, আর পুরুষ হইল লতা।"

"উল্টোটাই তো হওয়া উচিত।"

ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে হরগোপাল বলেন, "পুরুষের লাফঝাঁপ বেশি, তর্জন-গর্জন বেশি, গায়ের জোরও বেশি, কিন্তু আসলে পুরুষগুলি ম্যাড়া। কিন্তু একখান ভাল মা আর একখান ভাল বউ পাইলে ওই ম্যাড়াই তখন সিংহ হইয়া ওঠে। মা বৃক্ষ, বউ বৃক্ষ, আর পুরুষ আসলে ওই লতা। খোটার জোরে ম্যাড়া কোন্দে, বুঝলি?"

"তোমার বুঝি সেটা হল না দাদু?"

হরগোপাল খুব হাসলেন, "না। আমি নিরালম্ব। তর মাইয়াটা হাসে না ক্যান রে? কাইল একটা লজেঞ্চুস দিলাম। নিল, কিন্তু খুশি হইল না।"

"আজকালকার বাচ্চারা খাবার জিনিস পেলে খুশি হয় না।"

"ঠিক কথা। আমরা যা পাইতাম ঝাপাইয়া খাইতাম। প্যাট আমাগো য্যান ভরতেই চাইত না। তর মাইয়াটা খুশি হয় কীসে?"

"কী জানি দাদু। খাবার, খেলনা, গল্প বলা কোনও কিছুতেই খুশি হতে চায় না।"

"এ মেলানকলিক চাইল্ড।"

"হ্যাঁ দাদু।"

"বুঝলি, দিজ আর ডিফিকাল্ট ডেজ। চাইল্ড সাইকোলজিও আর আগের মতো নাই। এভরিথিং ইজ কমপ্লিকেটেড, ভেরি কমপ্লিকেটেড।"

"ঠিক কথা দাদু।"

"মাইনষের বুদ্ধি যত বাড়ে ততই লিভিং বিকামস ডিফিকাল্ট। বুঝলিনি?"

"একটু একটু।"

"এই দেখ, এইটা সত্যেন আমারে দিছে।"

"ওমা। ওটা তো মোবাইল ফোন!"

"হ। ভাল না?"

"হ্যাঁ, দামি ফোন তো।"

"এইটুক যন্ত্রের মইধ্যে কী নাই ক' তো! মাইনষের বুদ্ধিরও বলিহারি। কিন্তু কী জানস, সো মাচ কমিউনিকেশনস শ্যাটার দি প্রাইভেসি অফ এ পারসন। মোবাইল পাইয়া মাইনষে কথা কওয়া বাড়াইয়া ফালাইল। কথা নাই, কিন্তু তবু কথা কইয়া যায়। শ্যাষে কথা ফুরাইয়া গিয়া অখন হাবিজাবি কইতে থাকে।"

পিউ হেসে ফেলে বলে, "তুমি কার সঙ্গে কথা বলো দাদু? নিরুপমা ঠাকুমার সঙ্গে?"

হরগোপাল একটু লজ্জার হাসি হেসে বলেন, "না, তাইনের লগে আমার তো কথার সম্পর্ক না। কথা না কইলেও রিলেশন থাকে। ইফ দি রিলেশন ইজ ডিপ ওয়ার্ডস আর সুপারফ্লুয়াস।"

"তোমার নম্বরটা আমাকে দিও দাদু, আমি সেভ করে রাখব। ভয় নেই, তোমার প্রাইভেসিকে ডিস্টার্ব করব না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করব, কেমন আছ?"

"হ, হ, আমিও তো হেইরেই কই। মাইনষেরে মাঝে মাঝে জিগাব, কেমন আছ হে। কেমন আছ?"

সাত

মুশকিল হয়েছে দিব্যাঙ্গনা পটেলকে নিয়ে। দিব্যাঙ্গনা বিভিন্ন কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত এবং এতই বেশি বাইরে বাইরে থাকেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াই কঠিন ব্যাপার। মন্দারের সমস্যা সেটাও নয়। বস্তুত দিব্যাঙ্গনার সঙ্গে তার কোনও কাজ নেই, শুধু মাস পয়লা ছাড়া। সেদিন দিব্যাঙ্গনার মেয়ে রিচাকে পড়ানোর জন্য মন্দারের মাসকাবারি বেতন পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই তুচ্ছ ব্যাপারটার কথা দিব্যাঙ্গনা প্রায়ই ভুলে যান। কিন্তু আবার হঠাৎ হঠাৎ তাঁর তুচ্ছ কথাটা মনেও পড়ে যায়। তখন এক খামচা টাকা নিয়ে প্রায় ছুটে আসেন, হাই মাস্টারজি, আই টোটালি ফরগট টু পে হউ দি অনরেরিয়াম। মুশকিল সেখানেও। প্রায় সময়েই পরে গুনে দেখেছে মন্দার, টাকাটা হয়তো পাওনা টাকার দ্বিগুণ বা তিন গুণ। তখন আবার দিব্যাঙ্গনার জন্য অপেক্ষা করে ওত পেতে তাকে ধরতে হয়। দিব্যাঙ্গনা খুবই বিস্মিত হয়ে বলেন, "ওঃ নো মাস্টারজি, আই ডিডনট পে ইউ ডাবল অ্যামাউন্ট!"

দিব্যাঙ্গনা একটু এরকমই। তাঁর স্বামী জীবেশ পটেল অনেকগুলো ব্যবসার মালিক। ফলে তাঁকেও বাড়িতে কখনও পাওয়া যায় না। মন্দার আজ অবধি তাকে চোখেও দেখেনি। দিব্যাঙ্গনা এক সময়ে নাচতেন, এখন ফ্যাশন ডিজাইন করেন, বুটিকের দোকান দিয়েছেন, দুটো বিউটি পার্লার চালান। ভীষণ ব্যস্ত মহিলা।

রিচা রোগা, ছোট্ট, শান্ত ফুটফুটে একটা মেয়ে। মাত্র আট বছর বয়স। লেখাপড়ায় তেমন মাথা নেই বলে স্কুলে গ্রেড পায় না। কিন্তু খুব চুপ করে বসে মাস্টারজির কাছে পড়ে।

নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে বলেই মন্দার তাকে খুব যত্ন করে ধৈর্যের সঙ্গে পড়ায়।

সেদিন সন্ধেবেলা পড়াচ্ছিল মন্দার। সেই সময়ে ভিতরবাড়ি থেকে একজন আয়া গোছের মহিলা ব্যস্ত হয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, "একটু আসুন তো মাস্টারজি। মাতাজি কেমন যেন করছে। ম্যাডামকে ফোনে পাচ্ছি না।"

মন্দার তাড়াতাড়ি উঠে আয়ার সঙ্গে ভিতরকার ঐশ্বর্যশালী অন্দরমহলের একটা ঘরে ঢুকে দেখল, খুব বৃদ্ধা এক মহিলা হাঁ করে প্রাণপণে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন। মুখে কথা নেই। হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করছেন। বোঝা যাচ্ছে, অসহ্য ব্যথা।

"ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন?"

"দিয়েছি। ফোন ধরছেন না।"

"অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর আছে?"

"অ্যাম্বুলেন্স কেন?"

"এখনই কোনও হাসপাতালে নেওয়া দরকার।"

"ম্যাডামকে না জানিয়ে?"

"দেরি হলে বিপদ হতে পারে।"

আয়াটা তবু দোনোমোনো করছিল, কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মন্দার ভালই চেনে। এক বছর আগে তার বাবারই হয়েছিল। সে বলল, "একদম দেরি করবেন না। ম্যাডামকে একটা মেসেজ দিয়ে রাখুন আর আগে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করুন।"

তাই করা হল।

আয়াটি এজেন্সি থেকে এসেছে। তেমন ডান বাঁ চেনে না। ট্রেনিংও সামান্য। বলল, "মাস্টারজি, এঁদের নার্সিংহোম বাইপাসে। সেখানে আমাকে পাত্তা দেবে না। আপনি চলুন।"

যেতে হল মন্দারকে। বহুবার ফোন করে দিব্যাঙ্গনাকে পাওয়া গেল না। ফোন ধরছেন না। জীবেশ কুয়ালালামপুরে। ভরসা শুধু দিব্যাঙ্গনার মায়ের ডাক্তার খুব নামকরা লোক। নার্সিংহোমে তাঁকে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

দিব্যাঙ্গনার মাকে ভর্তি করতে তেমন বেগ পেতে হল না। কিন্তু জানা গেল, অবস্থা খুব খারাপ।

আয়ার সঙ্গে রিসেপশনে বসে রইল মন্দার। তার যেটুকু করার ছিল করেছে। আর কী করার আছে তা বুঝতে পারছিল না। আয়াটি ভয় পাচ্ছে। বারবার বলছে, "মাস্টারজি, আপনি একটু থাকুন। ম্যাডাম এসে হয়তো আমার ওপর রাগ করবেন।"

"কেন, আপনার কী দোষ?"

"দোষ তো কিছু করিনি। ওষুধপত্র ঠিকমতোই খাইয়েছি। কিন্তু ম্যাডামের তো কিছু ঠিক নেই। এসেই হয়তো চেঁচামেচি করবেন।"

দিব্যাঙ্গনা এলেন রাত দশটা নাগাদ। আলুথালু চেহারা, স্খলিত বেশবাস, "হোয়াট হ্যাপেন্ড টু মম? হোয়াট হ্যাপেন্ড টু হার? ইজ শি স্টিল অ্যালাইভ!"

বিশাল নার্সিংহোমে যেন হিল্লোল তুলে দিলেন দিব্যাঙ্গনা। তাতে কাজও হল। বেশ একটা ব্যস্ততা পড়ে গেল চারদিকে।

ডাক্তার জানালেন, অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। রাতে একজন লোক যেন থাকে।

কিন্তু কে থাকবে? আয়া ধর্তব্যের মধ্যে নয়, জীবেশ বাইরে, দিব্যাঙ্গনার হাজারটা জরুরি কাজ। অগত্যা মন্দারকেই রাজি হতে হল। পরপর তিন রাত্রি। দিব্যাঙ্গনার সত্তর বছর বয়স্কা মা বেঁচেও গেলেন।

দিব্যাঙ্গনা বিস্তর কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানালেন বারবার। মন্দার বিরক্ত হয়নি। এই অন্যমনস্ক, চঞ্চল, কাজপাগল ও বেহিসেবি মহিলাটিকে সে পছন্দই করে। দিব্যাঙ্গনা আর যাই হোক, সংকীর্ণমনা নন।

এই ঘটনার ছ' মাস বাদে হঠাৎ একদিন দিব্যাঙ্গনা খুবই ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে মন্দারের হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এ গিফ্‌ট ফর ইউ।"

সঙ্গে একটা খাম। খামে দশ হাজার টাকা।

মন্দারের চোখ কপালে উঠল, "ম্যাডাম, এসব কী?"

"আপনার ঋণ তো শোধ করা যাবে না। ইটস জাস্ট এ টোকেন অফ আওয়ার রেসপেক্ট।"

মন্দার মাথা নেড়ে বলে, "তা হয় না ম্যাডাম, আমি এসব নিতে পারব না। আমি যেটুকু করেছি তা পাড়ার ছেলেরাও করে। সামান্য একটু সাহায্য করেছি বলে টাকা নেওয়ার অভ্যাস আমার নেই ম্যাডাম। মাপ করবেন।"

"ভারি অবাক হয়ে বললেন, বাট দি গিফ্‌ট!"

"কী আছে এতে?"

"একটা ল্যাপটপ।"

মন্দার আঁতকে উঠে বলে, "মাই গড! ম্যাডাম, আমি টিউশনি করে খাই। ল্যাপটপ দিয়ে আমার কী হবে?"

"লে লিজিয়ে না মাস্টারজি!"

"না ম্যাডাম, আপনি মাসকাবারে যা দেন তাই যথেষ্ট।"

দিব্যাঙ্গনা বেশ হতাশ হয়ে বললেন, "ইউ আর ইমপসিবল, মাস্টারজি।"

সপ্তাহে তিন দিন সে রিচাকে পড়াতে আসে। আর ওই তিন দিনই তার একটু টেনশন যায়। বেশির ভাগ দিনই অবশ্য দিব্যাঙ্গনা বাড়িতে থাকেন না। কিন্তু খেয়ালি মহিলাটি কবে আবার কোন বায়নাক্কা তোলেন তার ঠিক কি?

মাস দুই বেতন দিতে ভুলেই গেলেন দিব্যাঙ্গনা। তার জন্য ব্যস্ত হল না মন্দার। এরকমই তো দিব্যাঙ্গনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিন মাসের মাথায় দিব্যাঙ্গনা একদিন খুব সেজেগুজে বাইরে যাওয়ার সময় রিচার পড়ার ঘরে এসে হাজির। মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি। তার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, মাস্টারজি, কাল থেকে একজন অন্য টিউটর রিচাকে পড়াবে। এ কাজে আর আপনাকে দরকার নেই।

মন্দার খামটা নিয়ে একটু হেসে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম।"

মাসে মাসে দু'হাজার টাকা খুব খারাপ ছিল না। চাকরিটা গেলে একটু অসুবিধেয় পড়তে হবে। কিন্তু মন্দার আজকাল সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত।

রিচাকে পড়িয়ে বেরিয়ে আসার পর চাকরিটা কেন গেল সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল মন্দার। ভেবে কোনও সমাধান খুঁজে পেল না। এমন কি হতে পারে যে, দিব্যাঙ্গনার দেওয়া উপহার আর টাকা নেয়নি বলে তার প্রেস্টিজ বা ইগোতে লেগেছে! জবাবটা কোনওদিনই খুঁজে পাবে না মন্দার। কিন্তু মুশকিল হল, কোন অবস্থায় কী করা উচিত সেটাই বা ঠিক করা যাবে কী করে?

এইরকম একটা গোলমেলে মানসিক অবস্থায় একদিন হঠাৎ একটা আশ্চর্য ফোন এল। দু'দিন মৌনব্রত পালন করার পর ফোনটা রাত দশটার পর হঠাৎ বেজে উঠতেই একটু চমকে গিয়েছিল মন্দার।

"ভারী একটা গলা বলল, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম বিষাণ চ্যাটার্জি। আমি আপনার শ্বশুরবাড়ির দিককার ডিসট্যান্ট রিলেটিভ।"

মন্দার একটু উদ্বেগ বোধ করল। আবার ও তরফ তৎপর হচ্ছে কেন? সে বিনীত ভাবেই বলল, "আপনার একটু ভুল হচ্ছে। ওটা আর আমার শ্বশুরবাড়ি নেই। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

"জানি। আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

একটু দোনোমোনো করে মন্দার বলল, "ঠিক আছে। তবে দু'বেলা আমাকে অনেকগুলো টিউশনি করতে হয়। রবিবার ছাড়া—"

"ডান। সামনে রবিবার।"

নিজের গাড়িতে চাপিয়ে মন্দারকে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল বিষাণ।

"ড্রিঙ্কস চলবে?"

মন্দার মাথা নাড়ল, "না।"

"কী খাবেন বলুন।"

মন্দার হেসে বলল, "আপনি খান। আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।"

"অন্তত এক কাপ কফি?"

"ঠিক আছে।"

কফির অর্ডার দিয়ে বিষাণ তার দিকে চেয়ে বলল, "আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার। আমি পিউকে বিয়ে করব।"

মন্দার নির্বিকার মুখে কথাটা শুনল।

"কিছু বলবেন?"

মন্দার মাথা নেড়ে বলল, "না। আমার এতে কী বলার আছে?"

পিউ যখন কিশোরী ছিল তখন থেকেই ওকে আমার পছন্দ। কিন্তু নানা কারণে প্রস্তাবটা দিতে দেরি হয়ে গেল। ততদিনে পিউ আপনার সঙ্গে পালিয়ে যায়।

মন্দার চুপ।

কিন্তু ব্যাপারটা হল, আমি ওকে লক্ষ করলেও পিউ আমাকে কখনও লক্ষ করেনি। আমার প্রতি ওর আকর্ষণ তখনও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু আমার বিয়ের প্রস্তাবটা ও অ্যাকসেপ্ট করেছে।

মন্দার নিবিষ্ট চোখে কফির কাপটার দিকে চেয়েছিল। কালো কফি। দুধ মেশাতে হবে, চিনি চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। অনেক বায়নাক্কা। তার কফিটা তাই খেতে ইচ্ছে করল না। তার হঠাৎ দিব্যাঙ্গনার কথা মনে পড়ল। দিব্যাঙ্গনা তার মাইনে দিতে ভুলে যেত। তারপর বেহিসেবি অনেক টাকা দিয়ে ফেলত। দিব্যাঙ্গনা তাকে সামান্য একটু উপকারের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা আর একটা ল্যাপটপ দিতে চেয়েছিল। তারপর একদিন নির্মমভাবে তাকে তাড়িয়েও দেয়।

"আপনি বড্ড চুপচাপ।"

"আপনি বলুন। আমি শুনছি।"

"আপনার প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে আপনার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে তা আমি জানি।"

মন্দার জলের গ্লাস তুলে খানিকটা খেল। তারপর দেওয়ালে একটা আধুনিক জটিল ও দুর্বোধ্য পেন্টিং-এর দিকে চেয়ে রইল।

"আপনি কিছু বলছেন না।"

"বলার কিছু নেই তো!"

"কেন ওরা মেরেছিল জানেন?"

"বোধহয় মারার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই।"

"আমি বলতে চাই যে, ঘটনাটা শুনে আমি দুঃখ পেয়েছি।"

"আপনি দুঃখ পাবেন কেন?"

"আমি শুনেছি আপনি সেদিন আপনার মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"মেয়ের কথা আপনার নিশ্চয়ই এখনও খুব মনে পড়ে?"

"খুব।"

"সেই মেয়ে যদি অন্য কাউকে বাবা ডাকে, আপনার সহ্য হবে?"

মন্দার একটু ম্লান হেসে বলে, "মেয়ের সঙ্গে আমার তো কোনও সম্পর্কই হল না। অন্য কাউকে বাবা ডাকলে ডাকবে।"

"আর একটা কথা।"

"বলুন।"

"অনেক দিন আগে একটি মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছিলাম বলে মেয়েটির দাদা প্রকাশ্যে দলবল নিয়ে আমাকে পেটায়। সেই মার খেয়ে অপমানে লজ্জায় আমি পাগলের মতো হয়ে যাই। কিন্তু তার শোধ নিতে আমি উঠে পড়ে লাগি। সেই মার আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।"

মন্দার শান্তভাবে বিষাণের চোখে চোখ রেখে বলে, "হ্যাঁ, কিছু একটা আমারও হয়েছিল। ঠিক হয়তো আপনার মতো নয়। অন্য রকম।"

"কী রকম মন্দার?"

"আমার শরীরে আর ব্যথা নেই। কিন্তু আমি টের পাই আমার ভিতরটা মরে গেছে।"

বিষাণ আর কথা বলল না। তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

এসব মাসখানেক আগেকার কথা। আরও দুটো টিউশনি বেড়েছে মন্দারের। রোজ সকাল থেকে সন্ধে অবধি পড়ায় আর পড়ায়। মাঝে মাঝে তার হঠাৎ হঠাৎ করে দিব্যাঙ্গনার কথা মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। খুশি হয়ে কত কী দিতে চেয়েছিল। আবার হঠাৎ করে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল। যখনই মনে পড়ে তখনই হাসি পায় তার।

আজ সন্ধের পর প্রচণ্ড ঝড়জল হল। তারপর তোড়ে শুধু বৃষ্টি। কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগলা এক বৃষ্টি চারদিক লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে আজ।

লেক রোডের একটা বাড়িতে টিউশনি সেরে বেরোবার সময় ছাত্রীর মা শঙ্কিত হয়ে বললেন, "কী করে এই বৃষ্টিতে যাবেন মাস্টারমশাই?"

"চলে যাব।"

"বাসটাস কিছু তো নেই।"

মন্দার তবু হেসে বলল, "ঠিক চলে যাব।"

মায়ের ফোন এল বেরোবার মুখেই, "কোথায় তুই?"

"এই তো, কাছেই।"

"এই ঝড়-জলে কী করে আসবি?"

"ভেবো না মা, ঠিক চলে যাব।"

"কী জানি বাবা, বড্ড চিন্তা হচ্ছে।"

মন্দার পথে নেমে পড়ল। ছাতাটা একবার খুলতে চেষ্টা করায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোল্ডিং ছাতা উল্টে গেল। অনেক কষ্টে সেটাকে গুটিয়ে নিল মন্দার। তারপর বৃষ্টির অজস্র বল্লম ভেদ করে যেতে লাগল। জল ভেঙে মন্থর গতিতে হাঁটতে লাগল সে।

এরকম দুর্যোগে গন্তব্য অনেক দূরে সরে যায়। যেন কেউ কোথাও পৌঁছবে না আজ। ঠিকানা হারাবে। নেই হয়ে যাবে। জলের তলায় খোলা ম্যানহোল হাঁ করে আছে, ছেঁড়া ইলেকট্রিকের তার ঝুলে আছে

কেউটে সাপের মতো ছোবল দেবে বলে, আছে গলি-ক্রিকেটের ইট, গর্ত। কত বাধা, অবরোধ।

জল ভেঙে তবু হাঁটাটাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে মন্দার।

প্যান্টের পকেটে ফোনটা বাজছে। বোধহয় মা। বড় মুশকিল হল। ফোন না ধরলে মায়ের টেনশন হবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউতে একটা গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়াল মন্দার।

ভাল করে হ্যালো বলার আগেই একটা গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তুমি কোথায় বলো তো!"

গলাটা চেনা। অনেকদিন পরেও চিনতে ভুল হল না তার। কিন্তু অবাক হল না, চমকালও না। খুব সহজ গলায় বলল, "আমি। আমি তো এখন রাস্তায়, হাঁটছি।"

"আমি জানতে চাই তুমি এখন ঠিক কোথায়?"

"আমি বাড়ি ফিরছি। এখন সাদার্ন অ্যাভেনিউতে।"

"সেখান থেকে তো বাড়ি অনেক দূর।"

"হ্যাঁ। অনেক দূর।"

"কী করে ফিরবে?"

"দেখা যাক।"

"এখন রাত পৌনে ন'টা বাজে। রাস্তায় জল জমে গেছে। গাড়িটাড়ি কিছু চলছে না। তুমি কী করে ফিরবে?"

"তা তো জানি না। যত দূর যাওয়া যায়।"

সন্ধেবেলা থেকে আমি তোমাকে অনেকবার ফোন করেছি। কিন্তু তোমার নম্বরের শেষ চারটে ডিজিট ঠিকঠাক মনে পড়ছিল না। এইট থ্রি ফাইভ নাইন, নাকি থ্রি এইট ফাইভ নাইন, নাকি অন্য কিছু। পাঁচবার রং নাম্বার হল। তার মধ্যে দু'জন খুব ভাব করতে চাইছিল। একজন তো জানতে চাইছিল আমি কোথায় আছি, তাহলে সে এসে আমাকে রেসকিউ করে তার বাড়িতে আজ রাতের মতো নিয়ে যেতে পারে। এবং ওই দু'জন লোক এখনও হাল ছাড়েনি। বারবার ফোন করছে।

"আমাকে খুঁজছ! কোনও দরকার?"

"হ্যাঁ, ভীষণ দরকার। দরকার না হলে এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে রাস্তায় বেরিয়েছি কেন?"

"রাস্তায় বেরিয়েছ পিউ? রাস্তায়?"

"হ্যাঁ। প্রথমে তোমাদের বাড়িতে। তোমাকে না পেয়ে ঠিকানা নিয়ে এক টিউশনির বাড়িতে। তারা বলল, তুমি ছ'টার সময় চলে গেছ।"

"সর্বনাশ। তুমি এখন কোথায়?"

"তা আমি কী করে বলব বলো তো। একটু আগে চারু মার্কেটের কাছে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি না।"

"ধারে কাছে কোনও লোক নেই?"

"না। একটা ঘুপচি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

"কোনও সাইনবোর্ড? রাস্তার নাম?"

"কিচ্ছু না। আমি বোধহয় হারিয়ে গেছি। কান্না পাচ্ছে।"

"ভাল করে দেখো। দেখতে চেষ্টা করো।"

"এত বৃষ্টিতে কি কিছু দেখা যায়?"

"রেলব্রিজটা! ডাইনে বা বাঁয়ে লক্ষ করো তো!"

"না। শুধু বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি।"

"ঠিক আছে। মোবাইলটা সাবধানে রেখো, যেন জল না লাগে। আমি যাচ্ছি তোমার কাছে।"

"কী করে আসবে? আমি কোথায় তা তো আমিই জানি না।"

"তোমার কোন দিকে উত্তর, কোন দিকে দক্ষিণ তা বুঝতে পারছ?"

"দাঁড়াও। ভেবে দেখি। একটু আগে আমি বড় রাস্তা পেরিয়ে এসেছি। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আমার বাঁ দিকটা উত্তর, ডান দিকটা দক্ষিণ।"

"ফোন বন্ধ করছি পিউ। এখন বৃষ্টিতে ফোনটা বাঁচাতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

ফোনটা পকেটে ভরে ফের বৃষ্টিতে হাঁটুজলে নেমে পড়ল মন্দার। রাস্তাঘাট সে ভালই চেনে। হেঁটে হেঁটে সব চেনা হয়ে গেছে তার। বেশ খানিকটা হাঁটবার পর টের পেল স্টেডিয়াম বাঁ দিকে রেখে সে সিনেমা হলটা পার হচ্ছে। শেড-এর তলায় দাঁড়িয়ে সে ফের ফোন করল।

রিং হতে না-হতেই ধরল পিউ, "কী গো, কোথায় তুমি?"

"আসছি। এই বিপদের মধ্যে এভাবে আমার জন্য অপেক্ষা না করে বাড়িতে একটা ফোন করে দাও না কেন? গাড়ি এসে নিয়ে যাবে তোমাকে।"

অত্যন্ত তেজের গলায় পিউ বলল, "না।"

"না কেন?"

"আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি আসতে পারো তো এসো। নইলে আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।"

বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে। মন্দার পথে নেমে পড়ল। জল ভেঙে তাড়াতাড়ি কোথাও যাওয়া যায় না। পরিশ্রমও খুব। কিন্তু কী কারণে কে জানে আজকের এই কষ্টকর হাঁটাটা তার যেন গায়ে লাগছে না।

অনেকটা এগোল মন্দার। রাস্তা ফুরোতেই চায় না। তবে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমছে। একটা-দুটো গাড়ি ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন মানুষকেও দেখতে পাচ্ছে মন্দার, তার মতোই জল ভেঙে কোথাও পৌঁছনোর চেষ্টা করছে।

ফের ফোন করল সে।

"এখনও দাঁড়িয়ে আছ?"

"হ্যাঁ। শোনো, আমার বাঁ দিকে রেলব্রিজটা দেখতে পেয়েছি।"

"বাঃ! সেটা কত দূর?"

"দূর নয়। এই তো কাছেই। একটা লোক আমার কাছে আসবার চেষ্টা করছে। বোধহয় মাতাল। আমি কিন্তু দাঁড়াচ্ছি না। কোন দিকে যাব বলে দাও।"

"বাঁ দিকে। রেলব্রিজের তলা দিয়ে..."

"ঠিক আছে।"

মন্দার প্রাণপণে হাঁটতে লাগল, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। বৃষ্টি পড়ছে। সর্বাঙ্গে জলের ধারা। বৃষ্টির ডুগডুগি বাজছে মাথায়। তবু মনে হচ্ছে তার মৃত অভ্যন্তরে আজ উৎসবের বাড়ির মতো আলো জ্বলছে। অনেক অতিথির সমাগম। হাসি হুল্লোড়।

অন্য দিক থেকে পিউ খুঁজতে খুঁজতে আসছে তাকে। কে জানে তাদের দু'জনের ইহজন্মে দেখা হবে কিনা। কিন্তু খুঁজতে তো হবেই।

আট

চোখ কপালে তুলে সত্যেন বলে, "আপনি মোটরবাইকের পিছনে চড়তে চান হয়দাদু? সর্বনাশ।"

"ক্যান রে। সর্বনাশের কী হইল? কত মাইয়ালোকে চড়ত্যাছে।"

"ওটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার দাদু।"

"আহা, আমি তো আর চালামু না, তুই চালাবি, আমি তো পিছনে বইয়া থাকুম। টাইট মাইরা বইয়া থাকুম।"

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার অভ্যাস নেই, যদি মাথাটাথা ঘুরে পড়ে যান!"

"আরে না। এক কাল কইলকাতায় সাইকেল কম চালাইছি নাকি? পারুম। আগে একখান পাক মাইরা আসি।"

"আপনি একজন স্টার্বন ওল্ড ম্যান। ঠিক আছে, চলুন।"

হরগোপালকে পিছনে বসিয়ে মোটরবাইকে বেশ খানিকটা ঘুরে বেড়াল সত্যেন। দিব্যি বসে রইলেন হরগোপাল। ভয়টয় পেলেন না।

"দেখলি?"

"দেখলাম। কিন্তু মোটরবাইকে ঠাকুরপুকুর যাওয়াটা এত সহজ হবে না। রাস্তা খারাপ। তার ওপর আমার একস্ট্রা হেলমেট নেই।"

"তর টুপিটা বড় জব্বর।"

"আপনার মাঝে মাঝে উদ্ভট খেয়াল হয়, তাই না?"

হরগোপাল গাল ভরে হাসলেন। বললেন, "পুরুষ মানুষ যদি বুড়া বয়স পর্যন্ত ব্যাচেলর থাকে তবে তার বাতিকের দোষ হয়।"

"আপনারও কি তাই হয়েছে?"

"হু ক্যান ডিফাই নেচার?"

সত্যেন হাসল, "আপনার জ্ঞানের নাড়ি তো টনটনে।"

"আমাগো ধীরেন ডাক্তারের বহুমূত্র হইছিল। প্রায় লুকাইয়া চিনি বাতাসা লজেঞ্চুস খাইত। জ্ঞান দিয়া কি প্যাশনরে সামলানো যায় রে দামড়া? যে ব্যাটা চুরি করে হ্যায় কি জানে না চুরি করা মহাপাপ?"

"ঠিক আছে দাদু। বুঝেছি। আপনাকে আমি মোটরবাইকে চাপিয়েই ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যাব।"

হরগোপালের মুখ ভারি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠিক যেমন মোবাইল ফোনটা পেয়ে হয়েছিল।

"এতদিন পরে ফ্যামিলি লাইফ কেমন লাগল হয়দাদু?"

হরগোপাল ফের হাসলেন। বিছানায় উবু হয়ে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "চানাচুর খাইছস তো! মেলা ভ্যারাইটিরে এক লগে মিশাইয়া থোয়। ফ্যামিলি মিনস ফিউশন।"

"ভাল লাগল না?"

"মেরিটস আছে, ডিমেরিটসও আছে। ইটস অল ইন দি গেম।"

"এবার হোম ছেড়ে এখানেই চলে আসুন। সবাই চায় এই বুড়ো বয়সে আপনার আর প্রব্রজ্যার দরকার নেই।"

হরগোপাল জুলজুল করে সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, "থাকলে আবার কোনখান দিয়া কোন প্রবলেম ফুরকি দিয়া ওঠে তার ঠিক কী রে?"

"প্রবলেমকে এত ভয় কেন দাদু?"

হরগোপাল লিকার চা'টি খুব উপভোগ করছিলেন, এ বাড়ির চায়ের কোয়ালিটি খুব ভাল। শান্তিনীড়ের চায়ের মতো ভ্যাতভ্যাতে নয়। কোটরগত দু'টি চোখ তুলে সত্যেনের দিকে চেয়ে বললেন, "আই ওয়াজ বর্ন এ কাওয়ার্ড, আই শ্যাল ডাই এ কাওয়ার্ড, বুঝলি ন

"বুঝলাম, আপনি আমাদের পছন্দ করছেন না।"

"ইউ আর এ গুড বয়। তরে একটা কথা কমু?"

"বলুন না।"

"এত খাতির পাইয়া আমার অভ্যাস নাই। বেশি খাতির যত্ন পাইলে শান্তিনীড়ে গিয়া উদপিদ লাগব। বুঝলি না?"

"বুঝলাম, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।"

হরগোপালের মুখে অনাবিল হাসি ফুটল। বললেন, "ফাজিল।"

পুরনো বর্জ্য জিনিসপত্রের মধ্যে হঠাৎ একটা হারিয়ে যাওয়া আংটি কিংবা প্রিয় একটি বই বা লাল বল পেয়ে যাওয়ার মতোই এক আবিষ্কার হরগোপাল। বিগতা গিরিবালার ফাঁকা ঘরের মেঝের বিছানায় উঁচু হয়ে বসে চা খাচ্ছেন নিবিষ্ট মনে। দৃশ্যটা তৃপ্ত মুখে দেখল সত্যেন।

হরগোপাল নিঃশেষে চায়ের কাপটি শেষ করলেন। মেঝেতে রেখে গিরিবালার ব্যবহৃত ছোট পিতলের ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধুলেন। তারপর বললেন, "তরে একটা কথা কই।"

"কী কথা?"

"আই এনজয়ড দি স্টে। কিন্তু ভাল জিনিসের অল্পই ভাল। বুঝলি?"

হয়দাদু কি একজন হ্যাপি ম্যান। নাকি আনহ্যাপি। এই একটা ব্যাপার ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে না সত্যেন। পরদিন যখন ব্যাগসমেত হরগোপালকে ঠাকুরপুকুরের শান্তিনীড়ে মোটরবাইকে চাপিয়ে পৌঁছে দিল সত্যেন তখন হরগোপালের মুখে বালকের মতো হাসি। খুশিতে যেন ফেটে পড়ছিল।

"কেমন লাগল দাদু?"

"মোটরসাইকেলে কখনও চড়ি নাই, বুঝলি। ইট ওয়াজ এ রাইড অফ এ লাইফটাইম।"

মোটরবাইকে চড়ে যে একটা লোক এত খুশি হতে পারে তা জানা ছিল না তার। সে তো রোজ চড়ে, কিছুই বোধ করে না তো। একটা মোবাইল ফোন পেয়ে খুশি, একটা খুনখুনে বুড়ির সান্নিধ্য পেয়ে খুশি, এক কাপ ভাল চা পেলে খুশি। কার যে কীসে সুখ কে জানে।

অসুবিধেটা সত্যেনের এখনও আছে। সবসময়েই মনে হয় কে যেন উঁকি মেরে দেখছে তাকে। খুঁটিনাটি লক্ষ রাখছে। নানা ছদ্মবেশে এসে ঘুরে যাচ্ছে সে। ক্যালকুলেটরে সত্যেনের জীবনের প্লাস মাইনাস মিলিয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করছে, আর ইউ হ্যাপি সত্যেন?

হ্যাপিনেস শালার তো ঠিকঠাক কোনও স্ট্যান্ডার্ড নেই। একবার কাটোয়া লোকালে এক বাউলের গান শুনে সত্যেন তার চেলা হয়ে যেতে চেয়েছিল। বাউল গেয়ে ভিক্ষে করার মতো এত সুখ আর কী আছে। আর যেদিন জানতে পেরেছিল যে, এলটন জন একজন হোমো সেদিন দুঃখে রাগে কি মরে যেতে ইচ্ছে যায়নি তার? এলটন জন কেন হোমো হবে? ভেবে দেখলে, লোকটা হোমো হলেই বা তার কী?

এসবের কোনও ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা নেই। মন্দারকে যে লাথিটা মেরেছিল তা থেকে প্রচুর সুখ উঠে এসেছিল পা বেয়ে। যেন ব্রাজিলের হয়ে আর্জেন্টিনার গোলে বল মারার সুখ। পরে যখন সেইজন্যই পিউদি তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল তখন নিজের পায়ের ওপরেই ঘেন্না এসে গিয়েছিল তার। ডান পা'টা যেন নিরন্তর তাকে ছিঃ ছিঃ করত। পাগলিনী শ্রীরাধিকার মতো এক দুর্যোগের রাতে ত্যাগ দেওয়া, ভ্যাগাবন্ড, নিষ্কর্মা, গুড ফর নাথিং মন্দারের কাছেই প্রাণ বাজি রেখে পিউদিদির ফিরে যাওয়া—ব্যাখ্যা নেই—কার সুখ কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কে জানে।

ঘণ্টা দুই টেনিস খেলে ফেরার সময় বাইকে স্টার্ট দিতে গিয়ে সত্যেন দেখল গভীর গণ্ডগোল। স্টার্টার ঝুলে গেছে, স্প্রিং কাজ করছে না। ঠেলেঠুলে ঘর্মাক্ত শরীরে মিস্তিরির কাছ অবধি পৌঁছে শুনল, এ মাল আজ মেরামত হওয়ার নয়। সময় লাগবে।

এসব পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দুনিয়াটার ওপরেই ঘেন্না এসে যায়। কী দরকার ছিল মোটরবাইকটার খারাপ হওয়ার?

রাগ করে লেক-এর ভিতর দিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল সে। হাঁটলে রাগটাগ কমে যায়। পায়ে কেডস, পরনে শর্টস, গায়ে টি-শার্ট সব ঘামে ভিজে শপশপ করছে। মন ভরা বিরক্তি।

ফোন বাজল। যন্ত্রটা কানে তুলে ভেতরকার গজরানো রাগেই বোধহয় যে-'হ্যালো'টা বলল তাতে সোঁদরবনের বাঘের গর্জনের ছায়া ছিল। বোধহয় তার ফলেই ওপারের লোকটা ভয়ে ফোন কেটে দিল।

যখন রাত ন'টায় সুস্থির হয়ে স্নান করা ঠান্ডা শরীরে ছাদের অন্ধকারে একা বসে গুনগুন করে 'স্ট্রেঞ্জারস ইন দি নাইট' গাইবার চেষ্টা করছে তখনই ফের ফোনটা এল, একই নম্বর থেকে।

"বলুন।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে একটা দুর্বল মেয়েলি গলা পাখির স্বরে বলল, "আমি কি সত্যেন রায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"কে বলছেন?"

"আমি ঘুঙুর।"

"ঘুঙুর? ঘুঙুর কে?"

"আমি..."

পৃথিবীতে আর একটা নতুন প্রেমের গল্প শুরু হল।

কতবার হয়েছে। আরও কতবার হবে।

অঙ্কন: সমীর সরকার